ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী

এম.ফিল রেজি নং-১০৯

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন- ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল বা অন্য কোন ডিগ্রির উদ্দেশ্যে কোনো গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং কোথাও প্রকাশ করা হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য দাখিল করতে অনুমোদন করছি।

46032

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক **ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান** এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছি। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি এবং কোনো ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায়ও উপস্থাপন করিনি।

25/06/11

(মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী)
এম.ফিল, রেজি. নং ১০৯
শিক্ষাবর্ষ ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

465032

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতাবাণী

সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার শক্তি ও সামর্থ দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি, যিনি মানবজাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা'– অভিসন্দর্ভটি আমার দুই বছরের পরিশ্রমের ফল। এ সময়ে আমি এ অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে বহু সুধী ও প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ করেছি। অভিসন্দর্ভ সম্পাদনে আমি যাঁদের কাছে ঋণী তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমি পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান স্যারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যিনি আমার অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণা পদ্ধতি, তত্ত্ব-তথ্য, উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ ও তার সমন্বয় সাধন এবং পান্ডুলিপি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে সার্বক্ষণিক নির্দেশনা এবং আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। নানাবিধ কর্মব্যস্ততার মাঝেও তিনি যেভাবে আমাকে সময় দিয়েছেন তা শুধু একজন জ্ঞানতাপস ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তাঁর মহত্ব ও ঔদার্য আমাকে করেছে চির ঋণী।

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিক আহমেদ, অধ্যাপক ড. আবদুল বাকী, অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ, সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ মুসলেহ উদ্দীনসহ বিভাগীয় শিক্ষক মন্ডলীর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, পরামর্শদান ও সার্বিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আর যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মুফাস্‌সিরে কুরআন মাওলানা আবুল হাশেম। তিনি সর্বক্ষণ আমাকে গবেষণা কর্মে সাহস, উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তাঁর উপদেশ ও পরামর্শের কারণেই আমার পক্ষে এত বড় কঠিন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এজন্য পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য হায়াতে তাইয়্যেবা কামনা করছি। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার স্নেহময়ী মা সালেহা বেগমকে। তাঁর সার্বক্ষণিক অকৃত্রিম ভালোবাসায় গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে সহায়ক হয়েছে। যাঁদের কথা উল্লেখ না করলে কৃতজ্ঞতাবাণী অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাঁরা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় বড় দুই ভাই মাওলানা রুহুল আমিন এবং ইবনে সীনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ নূরুল্লাহ। আমাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁদের উপদেশ, অনুপ্রেরণা ও ঐকান্তিক চেষ্টা চির স্মরণীয়।

আমার গবেষণা কর্ম সম্পাদনার ক্ষেত্রে তত্ত্ব, তথ্য, উপকরণ সংগ্রহের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় লাইব্রেরি, ই.ফা.বা. লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গমন করেছি, অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের এবং অভিসন্দর্ভ কম্পোজের জন্য উত্তরা কম্পিউটার স্কুলের পরিচালক মোঃ মজিবুর রহমান ও মোঃ আজগর আলী এর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী। এদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল।

পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করে নেন এবং পরকালে এটিকে নাজাতের ওয়াসিলা করে দেন। আমীন!

মোহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বাংলা ও ইংরেজি শব্দের

সংকেত পরিচয়

আ.	-	আলাইহিস সালাম
স.	-	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	-	রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু/আনহা/ আনহুমা/আহুন্না/আনহুম
র.	-	রহ্‌মাতুল্লাহ্‌ আলাইহি/রহিমাহুল্লাহ্‌
বুখারী	-	আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল বুখারী
মুসলিম	-	মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল কুশাইরী
হি.	-	হিজরী
খ্রি.	-	খ্রিস্টাব্দ
পৃ.	-	পৃষ্ঠা
ড.	-	ডক্টর
ই.ফা.বা.	-	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ঢা.বি	-	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
P.	-	Page

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করার সকল ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহাবায়ে কিরাম যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা সকল যুগের মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাহাবায়ে কিরামের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছেন উম্মাহাতুল মু'মিনীনসহ অনেক নারী সাহাবী, যাঁরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁরা ছিলেন মুসলিম নারী জাতির পথিকৃত। তাই বর্তমান সময়ে মুসলিম নারীদের ঐতিহ্যবাহী পূর্বসূরী নারী সাহাবীগণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে বিশ্লেষণাত্বকভাবে তুলে ধরতে 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা'– শিরোনামে গবেষণা করতে আগ্রহ পোষণ করি। গবেষণাটি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করা হয়েছে–

- নারী সাহাবীগণের গৌরবোজ্জ্বল জীবন-চরিত সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সঠিকভাবে অবহিত করা।
- ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং রাসূল (স.)কে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে নারী সাহাবীগণ যে অকৃত্রিম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা তুলে ধরা ।
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা তুলে ধরা।
- বর্তমান মুসলিম নারী সমাজকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ ও চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা।
- ইসলামের নারী অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন অপপ্রচারের অপনোদন করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিকে আমি ভূমিকা, চারটি অধ্যায় এবং একটি উপসংহারে বিন্যাস করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টি ইসলামে নারী, সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি ও সাহাবীগণের মর্যাদা– শীর্ষক ৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। মানবতার ধর্ম ইসলাম শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইবাদাত-বন্দেগী তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে যথাযোগ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম কন্যা হত্যা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীকে সমাজের সম্মানিতা সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমাজ জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে নারীদের পরামর্শ ও উপদেশ দানের অধিকার প্রদান করেছে। নারীর জন্য পিতা-মাতা, স্বামী, সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সম্পদের অংশ নির্ধারণ করেছে। ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে নারীকে মতামত দানের অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছে। নারীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দান করে অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতন হতে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বিয়ের সময় স্ত্রীকে মাহর প্রদান করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারীকে রুজি-রোজগার করে অর্থোপার্জনের অধিকারও ইসলাম প্রদান করেছে। ইসলাম নারীকে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের অধিকার নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল নারী রাসূল (স.)কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদেরকেই নারী সাহাবী বলা হয়। সমগ্র নারী জাতির উপর তাঁদের মর্যাদা স্বীকৃত। তৃতীয় পরিচেছদে সাহাবীগণের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। নবী ও রাসূলগণের পরে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও সম্মান সকলের উর্ধ্বে। সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন কেউ একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়টিকে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের অবস্থা এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা এ দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে ইসলাম পূর্ব আরবে নারীর শোচনীয় অবস্থা আলোচিত হয়েছে। এ যুগে কন্যা সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিল না। অনেক পিতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। যাদেরকে জীবিত রাখা হতো, তাদেরকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে লালন পালন করা হতো। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে। ইসলাম পূর্ব বিশ্বের প্রায় সকল ধর্ম ও সভ্যতায় নারী ছিল অবহেলিতা ও নির্যাতিতা। মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিলো না।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়টি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম নবুওয়্যাত ও রিসালাতের উপর ঈমান এনেছেন এবং জীবনের সবটাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর জীবনে ছায়ার মতো ভূমিকা পালন করেছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.) যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা মুসলিম জাতির জন্য চির স্মরণীয়। তিনি রাসূল (স.) থেকে ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও সাহিত্যের পাঠদান করতেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন রাসূল (স.)-এর পরিবারিক জীবনের আদর্শের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়টি দু'টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে নবী তনয়াগণের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অবশিষ্ট নারী সাহাবীগণের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। ইসলামের সূচনা পর্বে কাফিরদের বাধা-বিপত্তি ও যুল্‌ম-নির্যাতন সত্ত্বেও পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি নারী সাহাবীগণও চূড়ান্ত রকমের সাহস ও দৃঢ়তার সাথে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা খুব সহজে ইসলাম গ্রহণই করেছেন তাই নয়, বরং তাঁরা অতি স্বচ্ছন্দভাবে ইসলামের প্রচারও করেছেন।

চারটি অধ্যায়ের পরে উপসংহারের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে। পরিশেষে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় সহায়ক গ্রন্থপঞ্জির একটি বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকেই একজন মুসলিমকে জীবন-যাপন করতে হয়। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহাবায়ে কিরাম যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা সকল যুগের মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাসূল কারীম (সা.)-এর যুগেই তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সাহাবীগণের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছেন উম্মাহাতুল মু'মিনীনসহ অনেক নারী সাহাবী। যাঁরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। সমগ্র নারী জাতির উপর তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান স্বীকৃত।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানবতার অর্ধাংশ হিসেবে নারীদেরকে দেয়া হয়েছে যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা। নর ও নারী মিলেই মানবজাতি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মানবতার ধর্ম ইসলাম শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইবাদাত-বন্দেগী তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে যথাযোগ্য অধিকার প্রদান করেছে।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রতিটি স্তরেই নারী সাহাবীগণ অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। যিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন একজন নারী। তিনি হযরত খাদীজা (রা.), যিনি তদানীন্তন বৈরী পরিবেশেও নিজেকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পরবর্তী জীবনের সবটাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর জীবনে ছায়ার

Dhaka University Institutional Repository

মতো ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও আরও বহু নারী সাহাবী আছেন যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে হযরত আয়িশা (রা.), হযরত সুমাইয়া (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত আয়িশা (রা.) ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও সাহিত্যের পাঠদান করতেন।

এছাড়াও জন্মভূমি ছেড়ে প্রথমে হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরাত, জিহাদে অংশগ্রহণ, সমাজ সেবা ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডে যোগদানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী সাহাবীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। উহুদ যুদ্ধে উম্মু উমারা (রা.)-এর বীরত্ব, ইয়ারমুকের যুদ্ধে আসমা বিন্‌তে ইয়াযীদ (রা.) কর্তৃক নয়জন রোমান সৈন্যকে প্রতিহত করা, সাইপ্রাসের জলযুদ্ধে উম্মু হারাম (রা.)-এর অংশগ্রহণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকাকে আরো সমুজ্জ্বল করেছে। বদর, উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধে নারী সাহাবীগণ কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, কখনো সৈন্যদের পশ্চাতে থেকে তাঁদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দান, পানি পান করানো, আহতদের সেবা-শুশ্রুষা, তীর কুড়িয়ে দেয়া, খাদ্য তৈরি প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁরা ছিলেন মুসলিম নারী জাতির পথিকৃত। তাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা মুসলিম জাতির জন্য স্মরণীয়। কোনো জাতিকে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন, প্রগতিশীল ও স্বাবলম্বী করতে তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মহৎ মনীষীদের গৌরবোজ্জ্বল জীবনালেখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমান সময়ে মুসলিম নারীদের ঐতিহ্যবাহী পূর্বসূরী নারী সাহাবীগণের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় এ সংক্রান্ত কোনো গবেষণা কর্ম আমার জানামতে সম্পন্ন হয়নি। আরবি ও বাংলাভাষায় সাহাবী ও নারী সাহাবীগণের জীবন চরিতের উপর অনেক গ্রন্থ রচিত হলেও তাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা স্বাতন্ত্রিকভাবে গবেষণামূলক পদ্ধতিতে আলোচিত ও পর্যালোচিত হয়নি। তাই এ বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা বিচার করে বিষয়টির উপর গবেষণা করতে আগ্রহ পোষণ করি।

এ অভিসন্দর্ভে স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। এর তথ্য, উপাত্ত যতটা সম্ভব প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ, জীবনীগ্রন্থ, রিজাল শাস্ত্র ও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল ও সাময়িকী ইত্যাদি হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব উৎস হতে নারী সাহাবীগণের জীবন চরিত, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বিভিন্ন গ্রন্থের লেখকের নাম আকারে বড় হওয়ায় ব্যবহারের সুবিধার্থে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নামটিই উল্লেখ করা হয়েছে। যা একটি 'শব্দ সংকেত পরিচয়' শিরোনামের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভের প্রারম্ভেই উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি প্রতি বর্ণায়নের ক্ষেত্রে বাংলায় সর্বজন গ্রাহ্য কোনো পদ্ধতি প্রচলিত না থাকায় আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ অনুযায়ী বহুল প্রচলিত নীতির অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ডক্টর হায়াৎ মামুদ রচিত 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন' (প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৫) এর সহায়তা নেয়া হয়েছে।

আলোচনার ধারাবাহিকতা এবং বর্ণনার প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার স্বার্থে প্রসঙ্গত দু'একটা বক্তব্য পুনরোল্লিখিত (... ...) হতে পারে। তাই ব্যাপারটিকে পুনরাবৃত্তি না বলে সংশ্লিষ্ট স্থানের আলোচনার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করাই কাম্য। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে হয়তো ক্ষেত্র বিশেষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আসেনি। ভবিষ্যতে অন্য কোনো গবেষকের গবেষণায় এ বিষয়ে আরো সূক্ষ্ম গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তা উদঘাটিত হবে বলে আমার সুদৃঢ় প্রত্যাশা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এ শ্রমকে কবুল করুন। আমীন!

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রত্যায়নপত্র		
ঘোষণাপত্র		
কৃতজ্ঞতাবাণী		I
শব্দ সংকেত পরিচয়		III
সারসংক্ষেপ		IV
ভূমিকা		VIII
সূচিপত্র		XI
প্রথম অধ্যায়	**ঃ সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি**	২
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ ইসলামে নারী	২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি	১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ সাহাবীগণের মর্যাদা	২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	**ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা**	২৬
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের অবস্থা	২৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ঃ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	**ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা**	৪২
প্রথম পরিচ্ছেদ	ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভূমিকা	৪২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ **ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা** ৫৪

তৃতীয় অধ্যায় ঃ **অন্যান্য নবী পত্নীগণের ভূমিকা** ৬৭

হযরত সাওদা বিন্‌ত যা'মআ (রা.) ৬৭

হযরত হাফসা বিন্‌ত ওমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) ৭৫

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযাইমা (রা.) ৮২

হযরত উম্মু সালামা বিন্‌ত আবী উমাইয়া (রা.) ৮৪

হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) ৯৩

হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্‌ত হারিস (রা.) ৯৯

হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফিয়ান (রা.) ১০৫

হযরত মায়মুনা বিন্‌ত হারিস (রা.) ১১০

হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত হুয়াই ইব্‌ন আখতাব (রা.) ১১৪

৪র্থ অধ্যায় ঃ **ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা** ১২১

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ **ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নবী তনয়াগণের ভূমিকা** ১২১

হযরত যায়নাব বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.) ১২১

হযরত রুকাইয়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.) ১২৮

হযরত উম্মু কুলসুম বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.) ১৩১

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.) ১৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ **অবশিষ্ট নারী সাহাবীগণের ভূমিকা** ১৪১

হযরত আসমা বিন্‌ত আবী বকর (রা.) ১৪১

হযরত সাফিয়্যা বিন্‌ত আবদিল মুত্তালিব (রা.) ১৪৭

হযরত আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা.) ১৫০

হযরত উম্মু আইমান (রা.) ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু হানী বিন্‌ত আবী তালিব (রা.)	১৫৯
হযরত আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা.)	১৬২
হযরত উম্মুল ফাদল বিন্‌ত হারিস (রা.)	১৬৪
হযরত উম্মু সুলাইম বিন্‌ত মিলহান (রা.)	১৬৭
হযরত উম্মু হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা.)	১৭০
হযরত সুমাইয়া বিন্‌ত খুরবাত (রা.)	১৭২
হযরত উম্মু রুমান বিন্‌ত আমের (রা.)	১৭৪
হযরত শিফা বিন্‌ত আবদিল্লাহ (রা.)	১৭৬
হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস (রা.)	১৭৮
হযরত ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা.)	১৮০
হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.)	১৮৩
হযরত খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা.)	১৮৫
হযরত উম্মু শুরাইক দাওসিয়া (রা.)	১৮৭
উপসংহার	১৮৯
গ্রন্থপঞ্জি	১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামে নারী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাহাবীগণের মর্যাদা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামে নারী

ইসলাম এক শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। বিশ্ব মানবতার সার্বিক উন্নয়ন ও সুষম অগ্রগতির স্বার্থে ইসলাম পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছে। মানবতার অর্ধাংশ নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম যে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে বিশ্বের অন্য কোন ধর্ম ও মতবাদে তার দৃষ্টান্ত নেই।

যখন অন্ধকার অমানিশা সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তারই মধ্য থেকে আরবে বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরে মানবতার কাছে নতুনরূপে প্রতিধ্বনিত হল মহান শ্বাশত বাণী। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন।"[১]

ইসলাম পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে কন্যা, স্ত্রী ও মাতা হিসেবে যে অভূতপূর্ব সম্মান প্রদান করেছে, স্বামী, পিতা ও সন্তানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে যে ন্যায্য অধিকার

[১] আল- কুরআন: সূরা আন-নিসাঃ ১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করেছে, বিবাহ-তালাক, শিক্ষা ও নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীদের আয়-উপার্জন প্রভৃতি বিষয়ে যে অধিকার প্রদান করেছে তা অত্যন্ত বাস্তবমুখী কল্যাণকর।

"Islam is the first religion in the world which specially allowed a woman rights as an individual including the capacity to enter into a contract, hold and administer property and pursue commerce and trade. Legal rights enjoyed by a woman under Muslim Personal Law are right to marry, right to divorce, right to inheritance, right to maintenance and right to receive dower etc."[2]

"ইসলামই বিশ্বের একমাত্র প্রথম ধর্ম যেখানে বিশেষভাবে তাদের ব্যক্তি সত্ত্বার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও তাদের কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার, সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিরও অধিকার দেওয়া হয়েছে, মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে একজন নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার, মহরানা গ্রহণ, ভরণ-পোষণ ইত্যাদির অধিকার ভোগ করার ক্ষমতা রয়েছে।"

মনুষ্যত্বের বিকাশ, পার্থিব ও পরকালীন মুক্তি এবং সার্বিক উন্নতি জ্ঞানার্জন ব্যতিত সম্ভব নয়। তাই ইসলামী জীবনাদর্শে শুরু থেকেই জ্ঞানান্বেষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী কারীম (স.)- এর উপর অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীতেই জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

[2] 10th Comonwealth law conference, 1993. Nicosia, Syprus, P-413; Afroza Begum, Rights of Women under Muslim Law: Principles and Practice in Bangladesh, Islamic University Studies, Vol-2, No-1. December 1999, P.20.

Dhaka University Institutional Repository

"পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৩]

নবী কারীম (স.)ও জ্ঞান অন্বেষণে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বাণী প্রদান করেছেন-

طلب العلم فريضة على كل مسلم

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয।"[৪] এ হাদীসে মুসলমান বলতে নারী ও পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।[৫]

নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দানের ব্যবস্থাকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করে নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ মর্মে রাসূল (স.) ইরশাদ করেন– "যার অধীনে ৩ জন কন্যা বা বোন আছে, সে তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে এবং সে এ বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তবে তার জন্য জান্নাত অপরিহার্য। জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, যদি দু'জন থাকে? নবী কারীম (স.) বললেন– দু'জন হলেও। অন্য বর্ণনায় একজনের কথাও এসেছে।"[৬]

---

[৩] আল-কুরআন, সূরা আল-আলাক: ১-৫

[৪] *সুনান ইবন মাজাহ,* আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবিনী, আশ্‌রাফী বুক ডিপো, ইউ.পি, ভারত, ১৯৮৫, পৃ. ২০

[৫] *আল-মুসলিমূন,* ড. আব্দুল ফাত্তাহ, (*লামহাত মিন তারীখি ওয়া আল-মুহাদ্দিসীন),* আন্তর্জাতিক ইসলামী সাপ্তাহিক পত্রিকা, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি-১৯৮১, সৌদি আরব, পৃ. ৩০

[৬] *আশ-শা'ইবাতু মিনান নিসা,* সালীম তানীর, দারুল কুতুব আল-আরাবিয়া, দামিস্ক, ১৯৮৮, পৃ.৩১; আল-বাসূল ইসলামী, ৪৪ খন্ড, ৭ম সংখ্যা, রাবীউস সানী, ১৪২০ হি., পৃ. ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল কারীম (স.) আরো ইরশাদ করেন– "কোন ব্যক্তি কন্যা সন্তানের অভিভাবকত্ব করে তাকে উত্তমভাবে লালন-পালন করলে ঐ কন্যা তার জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।"[৭] রাসূল কারীম (স.) কর্তৃক শিক্ষার প্রতি এরূপ গুরুত্ব আরোপের কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে শিক্ষার যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তাতে নারী শিক্ষারও ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বহু মুসলিম নারী আলেম, কবি, লেখিকা এবং শিক্ষিকা হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূলে কারীম (স.) থেকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি নারী সাহাবীগণও নি:সংকোচে ফিক্হ ফিদ-দ্বীন অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতি ছিলেন, তেমনি ছিলেন নারী মুফতি। হযরত ওমার, হযরত আলী, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবন্ মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবন ওমার (রা.) প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের মত হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.), হযরত উম্মু সালামা, হযরত হাফসা (রা.) প্রমুখ নারী সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদা সম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আবূ মূসা (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে– "আমাদের মাঝে যখনই কোন হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম" [৮]

---

[৭] সহীহ আল-বুখারী, মোস্তফা আল-হালাবী, কায়রো, শিষ্টাচার অধ্যায়, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা, চুম্বন ও আলিঙ্গন অনুচ্ছেদ, ১৩ খন্ড, পৃ. ৩৩; সহীহ মুসলিম (ইস্তাম্বুল) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ও শিষ্টাচার অধ্যায়, কন্যাদের প্রতি সুন্দর আচরণ অনুচ্ছেদ, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৮

[৮] *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার*, মাওলানা নো'মান আহমদ, শিবলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

মূসা ইবনে তালহা বলেন–

ما رأيت أحدا أفصح من عائشة رضي الله عنها

" আমি হযরত আয়িশা (রা.)-এর চেয়েও অধিক বাগ্মী ও শুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।"[৯]

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মানবতার অর্ধাংশ হিসেবে একমাত্র ইসলামেই নারী জাতিকে মূল্যায়ন করা হয়েছে যথাযথভাবে। অতএব কোন নারী যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলাম তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা, কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেন শরীআতের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।[১০]

পাশ্চাত্য বিশ্বে পুরুষ ও নারীর সম অধিকারের বিষয়টি প্রথম ১৯৪৫ সালের 'জাতিসংঘ সনদে' স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত ১৯৪৮ সালের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাসহ অনেক দলিলে নারী ও পুরুষের সাম্যের মৌলিক নীতিটি স্থান পায়। কিন্তু পাশ্চাত্য বিশ্ব এ নীতিটি স্বীকার করার প্রায় সাড়ে তের'শ বছর পূর্বেই ইসলাম সর্বপ্রথম নারীকে পুরুষের ন্যায্য সম অধিকার প্রদান করেছে। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে নারী ও পুরুষের সাম্যের বিধান প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

---

[৯] *আল-ইসাবা ফী তামঈযিস-সাহাবা*, ইবনে হাজার আসকালানী, ৪র্থ খন্ড, দারুল কুতুব, মিসর, পৃ. ৩৬০

[১০] *পর্দা ও ইসলাম*, সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, অনুবাদ- আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

"মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।"[১১]

ইসলামে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা উল্লেখ করে প্রফেসর আবদেল রহীম ওমরান বলেন–

"Islam is meant for men and women equally. Women are equal in worship, in carrying the message of Allah and in fulfilling other religious requirements."[১২]

"ইসলাম নারী ও পুরুষকে সমান চোখে দেখেছে। নারীরা আল্লাহর ইবাদাত, দ্বীন প্রচার ও অন্যান্য শারঈ অনুশাসন পালনে সমান অধিকার রাখে।"

শুধু সৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, ব্যবহারিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে তথা আইন প্রয়োগ, মুক্তিপণ, শাস্তির বিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পুরুষ মহিলাদের সম-অধিকারের প্রতি ইসলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

"হে বিবেকবান লোক সকল! কিসাসের মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত।"[১৩]

---

[১১] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ: ৭১

[১২] *Family planning in the legacy of Islam.* Prof. Abdel Rahim Omran, (Published with the United Nations Population Fund, London, New york, 1st published 1992) P. 44.

[১৩] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ১৭৯

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধের শাস্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে কোন বৈষম্য সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন– "চোর পুরুষ ও চোর মহিলার হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি।"[১৪]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন–

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে এক'শ বেত্রাঘাত করবে।"[১৫]

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে আদেশ-নিষেধ তথা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) কে আল্লাহ যখন জান্নাতে অবস্থানের জন্য বললেন এবং নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন, তখন সেই আদেশ ও নিষেধের সম্বোধন হযরত হাওয়া (আ.)-এর প্রতিও ছিল। যেমন ছিল হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি। ইরশাদ হয়েছে–

وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ

"তোমরা উভয়ে এই বৃক্ষের নিকটবর্তীও হয়ো না।"[১৬]

ইসলাম নারীর ধর্ম পালনের অধিকারকে পুরুষের ধর্ম পালনের অধিকার থেকে পৃথক করে দেখেনি এবং ধর্ম পালনের জন্য যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তাতেও পুরুষ

[১৪] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ৩৮
[১৫] আল-কুরআন সূরা আন-নূর: ২
[১৬] *আল-কুরআন*, সূরা আল-আ'রাফ: ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মহিলার মাঝে কোন তারতম্য করা হয়নি। পুরুষ পুরুষ হওয়ার কারণে এবং মহিলা মহিলা হওয়ার কারণে বিশেষ কোন সুযোগ পাবে না ধর্মীয় ক্ষেত্রে।[১৭] মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন– "যারা সৎকর্ম করবে ও আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। তারা পুরুষ হোক বা নারী হোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতিদান বিন্দু পরিমাণও বিনষ্ট হবে না।"[১৮]

অন্য এক বাণীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নারী ও পুরুষের ধর্মীয় অধিকারকে অভিন্ন ঘোষণা দিয়ে বলেন– "নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদি পুরুষ, সত্যবাদি নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ, আল্লাহকে স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।"[১৯]

সকল ইবাদাতে ইসলাম নারী অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। হাজ্জে গমন, জিহাদে অংশগ্রহণ, জুমু'আ ও দুই ঈদে মহিলাদের অংশগ্রহণ করার অনুমতি ও সুযোগ দিয়েছে। রাসূল কারীম (স.) ইরশাদ করেন– "আল্লাহর দাসীদেরকে (নারীদেরকে) আল্লাহর মসজিদে আসতে বাঁধা দিও না।"[২০]

উপরের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলাম অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নারীদের অধিকার সমুন্নত রেখেছে।

---

[১৭] *নারী স্বাধীনতা: একটি নিরীক্ষাধর্মী পর্যালোচনা, শরীফ মুহাম্মদ রেজওয়ান, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৫ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১৬১*

[১৮] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ১২৪

[১৯] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাব: ৩৫

[২০] *সহীহ আল-বুখারী,* জুমু'আ অধ্যায়, *১ম খন্ড, পৃ. ১২৩; সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২*

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক দিক দিয়েও ইসলাম নারীকে যাবতীয় অধিকার প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক অধিকার বলতে ধন-সম্পত্তিতে মালিকানার অধিকার তার ইচ্ছামতো ধন-সম্পদ ব্যয় বা ব্যবহার করার পূর্ণ-স্বাধীনতাকে বুঝায়। ইসলাম তাঁর সূচনাকাল থেকেই নারীদেরকে ক্রয়-বিক্রয় এবং ধন-সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা লাভের অধিকার প্রদান করেছে। নারীর পিতা-মাতা, স্বামী, পুত্র ও নিকটাত্মীয়দের স্থাবর অস্থাবর ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও অংশীদারিত্ব ইসলাম তাকে প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ রয়েছে, আর তেমনি পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, পরিমাণে অল্পই হোক আর বেশিই হোক, এ অংশ নির্ধারিত।"[২১]

এছাড়া বিয়ের সময় মাহরের অর্থ একান্তই নারীর নিজস্ব সম্পদ, মাহর স্ত্রীর অবশ্য প্রাপ্ত একটি অধিকার। স্বামীর নিকট তারা এ অধিকার লাভ করে। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত। পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

"তোমরা খুশি মনে স্ত্রীদের মাহর দিয়ে দাও।"[২২]

---

[২১] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ৭
[২২] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ৪

মাহরের উদ্দেশ্য হলো নারীত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা এবং তালাকের ব্যাপারে স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এভাবে ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছে।

ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। ইসলাম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতামত প্রদান, ভোটাধিকার, সমালোচনা ইত্যাদির অধিকার প্রদান করেছে। রাজনীতির মৌলিক একটি দিক হলো– সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ। এসব ব্যাপারে পুরুষ যেমন ভূমিকা রাখতে পারে তেমনি নারীও পারে অবদান রাখতে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ
أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করে। সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকেই আল্লাহ কৃপা করবেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'[২৩]

ইসলাম নারীকে যথাযথ ও ন্যায্য সামাজিক অধিকারও দান করেছে। কন্যা সন্তানদের যাবতীয় ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের দায়িত্ব পিতা, ভাই কিংবা অন্য অভিভাবকদের উপর ন্যস্ত করে সামাজিকভাবে তাদের অধিকার প্রদান করেছে। পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পর নারীদের বিয়ে থেকে শুরু করে মাহর প্রদান, ভরণ-পোষণ এবং

---

[২৩] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবা:৭১

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও পারিবারিক প্রয়োজনীয়তার যাবতীয় দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে থাকে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম নারীদের উপর পুরুষদের কর্তৃত্ব দান করলেও সামাজিক কর্মকান্ডসহ সর্বক্ষেত্রে তাকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"স্ত্রীদের উপর স্বামীদের যেমন অধিকার আছে, স্বামীদের উপরও স্ত্রীদের ঠিক অনুরূপ সমান অধিকার রয়েছে।"[২৪]

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"স্ত্রীরা তোমাদের (স্বামীদের) ভূষণ আর তোমরাও তাদের ভূষণ।"[২৫]

এমনিভাবে ইসলামে নারীকে শিক্ষার অধিকার, বাক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রদান করেছে।

---

[২৪] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ২২৮
[২৫] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহাবায়ে কিরাম যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা সকল যুগের মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিম্নে সাহাবী শব্দের আভিধানিক ও পরিভাষিক পরিচয় তুলে ধরা হল।

সাহাবী শব্দের আভিধানিক অর্থঃ

সাহাবী (صحابي) শব্দটি সুহবাতুন (صحبة) শব্দ হতে উৎকলিত। শেষ বর্ণের ইয়া (ي)টি নিসবতি বা সম্বন্ধ বাচক। শব্দটি একবচন, যার অর্থ সাধারণত সঙ্গী, সাথী, সহচর, একসাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী।[২৬]

তবে অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা:-

ক. صحبة অর্থ رافقه(সে তার সাথী হয়েছে)[২৭] এ অর্থে আরবগণ শব্দটি সচরাচর ব্যবহার করে থাকে। যেমন কারো শুভ কামনায় তারা বলে–صحبك الله অর্থাৎ আল্লাহ তোমায় হিফাযত করুক এবং তাঁর সাহায্য তোমার সাথী হোক।[২৮]

খ. استصحبه অর্থ دعاه إلى الصحبة و لازمه বা সে তাকে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আহবান জানালো এবং তাকে স্থায়ী বন্ধুরূপে গ্রহণ করল।[২৯]

গ. অনুরূপ শব্দটি দীর্ঘ বা ক্ষণিক সাহচর্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়:

صحب فلانا حولا و دهرا و سنة و شهرا و يوما و ساعة

---

[২৬] *আর-রাইদ মূ'জাম লগূবী আসরী,* জুবরান মাসউদ, দারুল ইলম লিল মালাঈন, বৈরূত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৬, পৃ. ৯১২

[২৭] *আল-মূজামুল ওয়াসীত,* ইব্রাহীম মাদকুর, কুতুবখানা হোসাইনিয়া, দেওবন্দ, পৃ. ৫০৭

[২৮] আল-কামূস আল-মুহীত, ইয়াকুব ফিরোযাবাদী, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, ১৪০৩/১৯৮৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৯১

[২৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"সে এক যুগ, এক বছর, এক মাস, এক দিন বা ক্ষণিক সময় অমুকের সাহচর্য লাভ করেছে।"[৩০]

সাহাবী শব্দের বহুবচন আসে সাহাবা। তবে রাসুল কারীম (স.)-এর সঙ্গী সাথীদের বুঝানোর জন্য শব্দটির বহুবচন সাহাবা ছাড়াও আসহাব (أصحاب) এবং সাহাবও (صحب) ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩১]

সাহাবী শব্দের পারিভাষিক অর্থঃ

বিভিন্ন হাদীসবেত্তা ও পন্ডিতগণ বিভিন্নভাবে সাহাবীর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন আল্লামা ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন–

إن الصحابي من لقى النبى صلى الله عليه و سلم
مؤمنا به و مات على الإسلام

"সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।"[৩২]

আলোচ্য সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ১) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর প্রতি ঈমান, ২) ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাত (আল-লিকা), ৩) ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাউত আলাল ইসলাম)।

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাত লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমন: আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ মক্কার কাফিরবৃন্দ। দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাত দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি হুজুরের সাক্ষাত লাভ করেছেন। কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোন অক্ষমতার কারণে চোখে

---

[৩০] *লিসানুল আরব*, জালালুদ্দীন আবুল ফযল, দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, ২য় খন্ড, পৃ. ৭
[৩১] *আল-কামূস আল-মুহীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
[৩২] *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, ইবনে হাজার আসকালানী, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন: অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উম্মু মাকতুম (রা.)।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত আলাল ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবীদের দলে শামিল হবেন, যারা ঈমান অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তার পর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাত লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটাই সর্বাধিক সঠিক মত। যেমন- হযরত আশয়াস ইবন কায়িস (রা.) ও আরো অনেকে। হাদীস বিশারদগণ আশয়াস ইবন কায়িসকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ (ধর্ম ত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবূ বকরের (রা.) খিলাফাতকালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন।[৩৩]

উপরিউক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান সহকারে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশি বা অল্প দিনের জন্য হোক, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমনকি যে ব্যক্তি জীবনে মুহূর্তের জন্যও রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাক্ষাত লাভ ঘটেছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এমন সকলেই সাহাবীদের অন্তভুর্ক্ত।[৩৪]

হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র.) বলেন– "সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসূলুল্লাহ(স.)-এর সাহচর্য অথবা তার সাথে দু একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ।"[৩৫]

---

[৩৩] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৫

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[৩৫] উদ্বৃত: প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

কতক রিজাল শাস্ত্রবিদ সাহাবীর সংজ্ঞায় বলেছেন–

هم الذين شهدوا الوحي و التنزيل و عزفوا التفسير و التأويل

"যারা রাসূল (স.)-এর উপর কুরআন অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাফসীর ও তাবীল সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন।"[৩৬] কারো কারো নিকট– "সাহাবী শুধু তাদেরকেই বলা হয় যারা রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"[৩৭]

মাদ্দুল কামুস অভিধানে সাহাবীর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে–

"A companion of the prophet and it is conventionally applied to one who saw Mohammad and whose companionship with him was long, even it he have not related anything from him; or as some say, even if his companionship with him was not long."[৩৮]

রাসূল (স.)-এর সাথী বা সঙ্গীকেই সাহাবী বলা হয়। প্রচলিত অর্থে সাহাবী হলেন যিনি মুহাম্মদ (স.) কে দেখেছেন এবং দীর্ঘ সময় তাঁর সাহচর্য লাভ করেছেন। এমনকি যদি তার নবী কারীম (স.)-এর সাথে আত্মীয়তার বা অন্য কোন সম্পর্ক নাও থাকে, বা কতকের মতে, এমনকি কারো দীর্ঘ সাহচর্য লাভ না হলেও তাকে সাহাবী বলা হবে।[৩৯]

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য।

---

[৩৬] *কিতাবুল জারহি ওয়াদ তা'দীল*, আল-রাযী, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২, ১ম খন্ড,পৃ.৭

[৩৭] *উসুওয়াতুস সাহাবা*, আবদুস সালাম নদভী, মাকতাবা আরিফাইন, করাচি, ১৯৭৬, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬

[৩৮] *মাদ্দুল কামূস*, এ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম লিন, ইসলামিক বুক সেন্টার, লাহোর, ১৯৭২, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬৫৩

[৩৯] *সহীহ মুসলিম*, সাহাবীদের মর্যাদা পরিচ্ছেদ, হাদীস নং-২৫৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীত্ব প্রমাণ করবার উপায়ঃ

রাসূল (স.)-এর নবুওয়াতী জীবনের পরিসমাপ্তি লগ্নে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দলে দলে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের সবাই দুরত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান বা অন্যান্য কিছু কারণে রাসূল কারীম (স.)-এর সাথে সাক্ষাত করে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। সুতরাং এ বিশাল সংখ্যক মুসলমানদের মাঝে সাহাবীদের সনাক্তকরণ নিঃসন্দেহে একটি জটিল বিষয়। বিজ্ঞান ও হাদীস বিশারদগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মুলনীতির অনুসরণ করেছেন। তা হলঃ

১. 'খবরে তাওয়াতুর' অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন।
২. 'খবরে মাশহর' অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুর সংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক সাহাবী।
৩. কোন একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।
৪. কোন একজন প্রখ্যাত তাবেঈর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।
৫. কেউ নিজেই যদি দাবি করেন, আমি সাহাবী সে ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবেঃ

ক. আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠতাঃ এটি সাহাবীদের বিশেষ গুন। সাহাবিয়্যাতের দাবিদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুনটি অবশ্যই থাকতে হবে।

খ. মুয়াসিরাত বা সমসাময়িকতাঃ সাহাবীদের যুগ শেষ হয়েছে ১১০ হিজরীতে। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর ইন্তিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন, "আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে। আজ থেকে একশ বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না। সুতরাং

Dhaka University Institutional Repository

১১০ হিজরীর পর কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবি করলে, রিজাল শাস্ত্র বিশারদগণ তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি।[৪০]

এছাড়াও সাহাবী নির্ধারণের আরো কিছু নিয়মনীতি মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেছেন। যেমন–

ক. আওলাদুস সাহাবাঃ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে সাহাবীদের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাঁরা তাকে রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে নিয়ে আসতেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) শিশুর মুখে প্রথম খাবার তুলে দিয়ে তার জন্য দু'আ করতেন। যেহেতু নবী (স.) তাদেরকে দেখেছেন, সে জন্য তাঁরা সাহাবীরূপে গণ্য হবেন।

খ. খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্বদানকারী মুজাহিদগণ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা খুলাফায়ে রাশেদাহর চার খলীফা (রা.) তাঁদের আমলে কোন না কোন সাহাবীদের হাতেই বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের নেতৃত্ব অর্পণ করতেন।

গ. ইব্ন আবদিল বার (র.) বলেন– ১০ম হিজরীতে মক্কা ও তায়িফে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম কবুল করেননি। এ কারণেই তখনকার সবাই সাহাবীরূপে পরিগণিত হবেন। যেহেতু তাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসূল কারীম (স.) কে দেখেছেন।[৪১]

এসব নীতিমালা ও চিহ্নের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর সাহাবীদেরকে অনায়াসে চেনা বা সনাক্ত করা যেতে পারে।

---

[৪০] আসহাবে রাসুলের জীবনকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৪১] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭৩-১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

নারী সাহাবীদের পরিচিতিঃ

শুধু লিঙ্গগত (Gender) পার্থক্য ছাড়া পুরুষ ও নারী সাহাবীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যে সমস্ত শর্তাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন পুরুষকে সাহাবী হিসাবে গণ্য করা হয়, ঠিক একই শর্তাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে একজন নারীকে (صحابية) বা নারী সাহাবীরূপে গণ্য করা যায়।[৪২]

পুরুষ সাহাবীদের সাথে নারী সাহাবীরাও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর ভুমিকা প্রধান হয়ে উঠেছে।

---

[৪২] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাহাবীগণের মর্যাদা

নবী ও রাসূলগণের পরে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা ও সম্মান সকলের উর্ধ্বে। সাহাবীদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসাবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোন মুসলমানই, তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুনী ও সাধক হোন না কেন কেউ একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা একমত।[৪৩]

সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদার ব্যাপারে পরিত্র কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে অনেক মর্যাদা এসেছে। যৌক্তিকতার নিরিখেও তাঁরা উচু মর্যাদার দাবি রাখেন।

কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতে কারীমায় সাহাবায়ে কিরামের উচু মর্যাদা, তাদের পবিত্রতা এবং চারিত্রিক ও আদর্শিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি রিসালাতে মুহাম্মাদিয়ার একনিষ্ঠ সাক্ষীরূপে তাঁদেরকে সারা বিশ্বের কাছে উপস্থাপিত করে তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াতে কারীমা উপস্থাপন করা হলো:

সাহাবায়ে কিরামের আচরণ ও পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

"মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের প্রতি পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাঁদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাঁদের মুখমন্ডলে রয়েছে সিজদার চিহ্ন।"[৪৪]

---

[৪৩] *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৪৪] আল-কুরআন, সূরা আল-ফাত্হ: ২৯

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.) বলেন– সাহাবায়ে কিরামের গুনাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার মাঝে এ রহস্য নিহিত থাকাও বিচিত্র নয় যে, রাসূল (স.)-এর পর আর কোন নবী আসবে না। তিনি উম্মাতের জন্য কুরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদেরকে অনুসরণ করার আদেশ দিবেন। তাই কুরআনেও তাঁদের গুনাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৪৫]

সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ ও তাঁদের গুন-কীর্তন করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন– "মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট। আর তিনি তাঁদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তাঁরা থাকবে অনন্তকাল। নি:সন্দেহে এটা বড় সাফল্য।"[৪৬]

সাহাবীগণের মত ও পথকে সঠিক বলে ঘোষণা করে তাঁদের বিরোধিতাকে রাসূল (স.)-এর বিরোধিতার শামিল বলে ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "যে কেউ রাসূলের বিরোধিতা করে, তার কাছে সঠিক পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মু'মিনগণের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাঁকে ঐ দিকেই ফিরাবো, যে দিক সে গ্রহণ করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা নিকৃষ্টতম গন্তব্যস্থল।"[৪৭]

---

[৪৫] *তাফসীরু মা'আরিফুল কুরআন,* মুফতি মুহাম্মদ শফী, অনুবাদ- মুহিউদ্দিন খান, ইফাবা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯১, ৮ম খন্ড, পৃ. ৭৮

[৪৬] আল-কুরআন, সূরা আত-তাওবাহ: ১০০

[৪৭] আল-কুরআন, সূরা আন-নিসা: ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের প্রশংসা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন– "এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তাঁরাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করেছে ও ঈমান গ্রহণ করে তাঁরা মুহাজিরদের ভালোবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তাঁরা অন্তরে আকাঙ্খা পোষণ করে না। আর তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"[৪৮]

এমনিভাবে পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা আল-ফাতহ্, আয়াত-১৮, সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত-১০, সূরা আল-আনফাল, আয়াত-৬৪, সূরা আত-তাওবা, আয়াত- ১১৭-১১৮, সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত- ১৫-১৭, সূরা আল-আহযাব, আয়াত-২৩-২৪ প্রভৃতি আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রাসূল (স.) নিজেও সাহাবায়ে কিরামের সম্মান, মর্যাদা ও তাঁদের স্থান নির্ধারণ করে বাণী প্রদান করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু হাদীস উপস্থাপন করা হলো:

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) ইরশাদ করেন–

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق
مثل أحدٍ ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

[৪৮] আল-কুরআন, সূরা আল-হাশর, ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

"তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দেবে না, কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে ব্যয় করো তবুও তাঁদের যে কোনো একজনের 'মুদ' বা তাঁর অর্ধেক পরিমাণ যবের সমতুল্য হবে না।"[৪৯]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স.) বলেছেন– "আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম তাদের সাক্ষ্যের অগ্রবর্তী। তাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।"[৫০]

রাসূল (স.) বলেছেন– "যারা বাইয়াতে রিদ্ওয়ানে অংশগ্রহণ করেছে, তাঁদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[৫১]

রাসূল (স.) আরো ইরশাদ করেন– "আমার উম্মাতের মধ্যে একটি দলই নিশ্চিত জান্নাতি হবে। জিজ্ঞেস করা হলো তারা কারা? রাসূল (স.) বলেন, যারা আমার ও আমার সাহাবীগণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[৫২]

সাহাবীগণের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। তাঁদের সকল কর্মকান্ড মানবজাতির জন্য উৎকৃষ্টতম নমুনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ তুলনাহীন। রাসূল (স.)-এর অনুসরণ তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁদের জীবন-সম্পদ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য উৎসর্গিত। সুতরাং সাধারণ মুসলমানদের অপেক্ষা তাঁরা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান হওয়াই যৌক্তিকতার দাবি।

---

[৪৯] *সহীহ আল-বুখারী*, ইফাবা অনুদিত, ১৯৯১, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৩৬
[৫০] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৫
[৫১] *জামি আত্-তিরমিযী*, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৫
[৫২] *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩৫

Dhaka University Institutional Repository

নবী ও রাসূলগণের পর সাহাবীগণের সম্মান ও মর্যাদা সন্দেহাতীতভাবে সকল উম্মাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ। কেননা সাহাবীগণ ছিলেন মহানবী (স.)-এর সার্বক্ষণিক সহচর ও অনুসারী। রাসুল (স.)-এর পবিত্র সুহবতের বরকতে তাঁরা পূর্ণ মানবতার বাস্তব রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবিত অবস্থাতেই তাঁদের অনেকে জান্নাতের শুভসংবাদ লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

নারী সাহাবীগণও ছিলেন মুসলিম নারী সমাজের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি তাঁরাও রাসূল (স.)কে সার্বিক সহায়তা প্রদান ও ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাই তাঁরা মুসলিম উম্মাহর নিকট পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের অবস্থা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর অবস্থা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারীদের অবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর আবির্ভাবের সময় আরবের নারী সমাজের অবস্থা ছিল সকল দেশের নারীদের অপেক্ষা হীন। সে দেশে নারীদের উপর যেরূপ অত্যাচার-নির্যাতন চলতো, তা সত্যিই অভাবনীয়।

এ যুগের আরব অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর বলে মনে করতো। কন্যা সন্তানের জন্মই ছিল তাদের জন্য গভীর দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ। কন্যা সন্তানের জন্ম সে দেশে এক চরম অভিশাপ বলে গণ্য হতো। তারা যুদ্ধে যেতে পারতো না শুধু এই কারণে অনেক গোত্রের লোকেরা তাদের কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলতো বা পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করত। পরিতাপের বিষয় হলো, এ নিষ্ঠুরতা কোনো কোনো সময় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হতো যাদের হৃদয়কে স্নেহ ও ভালোবাসার উৎস বলে মনে করা হতো।[৫৩]

এক ব্যক্তি রাসূল (স.) কে তার জাহিলী যুগের বর্ণনা দিয়ে বলল– "আমার একটি কন্যা সন্তান ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। তাকে ডাকলেই সে খুশি মনে সাড়া দিতো। এমনি করে একদিন আমি তাকে ডাকলাম, সে দৌড়ে আমার কাছে আসলো। আমি তাকে নিয়ে নিকটবর্তী একটি কূপের পাশে গেলাম। তখন হঠাৎ করে ধাক্কা দিয়ে তাকে কূপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনো সে আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার করছিল।" তাঁর বর্ণনা

---

[৫৩] *ইসলামী সমাজে নারী,* সাইয়েদ জালালুদ্দীন আনসার উমরী, অনুবাদ- মোঃ মোজাম্মেল হক, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

শুনে রাসূল (স.)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। এমনকি তাঁর পবিত্র দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভিজে গেছে।[৫৪]

কাইস ইব্ন আসিম নামে এক ব্যক্তি জাহিলী যুগে আটটি কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছে।[৫৫]

নির্যাতিতা নারীদের মধ্যে যারা বাঁচার সুযোগ পেতো, তাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা সব কিছু ছিনিয়ে নেয়া হতো। যত নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করতো। পুরুষদের বিয়ের কোনো সীমা সংখ্যা নির্ধারিত ছিলনা। ইসলাম গ্রহণ করার সময় ওয়াহাব আসাদীর দশজন স্ত্রী ছিল।[৫৬] গায়লান সাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁরও দশজন স্ত্রী ছিল।[৫৭]

তালাকের ব্যাপারেও কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। তারা যতবার ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতো এবং ইদ্দাত পূর্ণ হওয়ার আগেই খেয়াল-খুশি মতো ফিরিয়ে আনতো কিংবা প্রত্যাহার করতো।[৫৮]

কোনো পুরুষ যখন কোনো স্ত্রী রেখে মারা যেতো এবং অন্য স্ত্রীর উদরজাত কিছু পুত্র সন্তান থাকতো, তখন পিতার রেখে যাওয়া স্ত্রীকে অর্থাৎ নিজের সৎমাকে বিয়ে করা ঐ পুত্র সন্তানেরই অগ্রাধিকার বিবেচিত হতো। পিতার অন্যান্য সম্পত্তির মতোই তা নিছক তার উত্তরাধিকার বলে বিবেচিত হতো।[৫৯]

---

[৫৪] *সুনানুদ্ দারেমী,* আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আবদির রহমান আদ্-দারেমী, কাদীমী কুতুবখানা, করাচি, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪

[৫৫] *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাসীর, মাক্তাবাতু আ'লামিল ইসলামিয়া, পেশ্ওয়ার ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৭৭

[৫৬] *সুনান আবু দাউদ,* আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআস, মাকতাবা রাশীদিয়া, দিল্লী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৪

[৫৭] *জামি' আত্-তিরমিযী,* আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত্-তিরমিযী, মাকতাবা রাশিদীয়া, দিল্লী, পৃ. ২১৪

[৫৮] *সুনান আবু দাউদ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

[৫৯] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,* ড. মুস্তাফা আস্ সিবায়ী, অনুবাদ- আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে আবু বকর জাস্‌সাস (র.) লিখেছেন–

و قد كان نكاح امرأة الأب مستفيضا شائعا في الجاهلية

"জাহিলী যুগে পিতার স্ত্রী সৎমাকে বিয়ে করা বহু প্রচলিত ছিল।"[৬০]

কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য কয়েকটি প্রথা চালু ছিল। তন্মধ্যে একটি প্রথা ছিল এমন, মেয়েকে বিয়ে দেয়ার সংবাদ প্রচার করা হতো। এরপর বিভিন্ন পুরুষ এসে ঐ মেয়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো। যদি কারো পছন্দ হতো তাহলে সে মেয়েটিকে বিয়ে করতো। আর পছন্দ না হলে সরে পড়তো।[৬১]

জাহিলী সমাজে অবাধে পরস্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতো এবং তা নিয়ে অলংকারিক ভাষায় কবিতা রচনা করতো। জুয়া খেলায় স্বীয় স্ত্রীকে বাজি রাখতো এবং খেলায় হেরে গেলে স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিত।[৬২]

ইয়াতীম মেয়েদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কোনো সুন্দরী ও সম্পদশালী ইয়াতিম বালিকা যদি কারো তত্ত্বাবধানে এসে যেতো, তাহলে সে নিজেই তাকে বিয়ে করতো, কিন্তু মাহর প্রদান করতো না।[৬৩]

জাহিলী যুগের নারীরা পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পদের উত্তরাধিকার হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। তারা কারো সম্পদের অংশীদার হতো না,

---

[৬০] *আহকামুল কুরআন*, আবূ বকর জাস্‌সাস, সুহায়েল একাডেমী, লাহোর, ১৯৯১, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৮

[৬১] *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, ড. মাহবুবা রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০. পৃ. ৩১

[৬২] *মোস্তফা চরিত*, মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ, ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃ. ২১৯

[৬৩] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তারা যদি কোনোভাবে কোনো সম্পদ উপার্জন করতো, অবস্থা অনুযায়ী তার মালিক হতো তার পিতা, ভাই বা স্বামী।[৬৪]

উহুদ যুদ্ধের পরের একটি ঘটনা। সাবিত ইব্ন কায়িসের স্ত্রী রাসূল (স.)-এর কাছে এসে এই মর্মে অভিযোগ করল যে, উহুদ যুদ্ধে তাঁর স্বামী সাবিত শহীদ হয়েছিল। তার দু'টি মেয়ে আছে। কিন্তু সাবিতের ভাই তার পুরো সম্পদই নিয়ে নিয়েছে। দুই মেয়ের জন্য সামান্য কিছুও রাখেনি। এখন তাদের কিভাবে বিয়ে হবে?[৬৫]

সে সমাজে সাময়িক বিয়ে, স্বীয় স্ত্রী বা কন্যাকে অপরের স্ত্রী বা কন্যার বিনিময়ে বিয়ে করা, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিয়ে, জোরপূর্বক বিয়ে ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। জাহিলী যুগে নারীদের সকল দিক দিয়েই চরম দুর্দশার প্রতি ইঙ্গিত করে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমার ফারুক (রা.) বলেন–

والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا
حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم

"আল্লাহর কসম! জাহিলী যুগে নারীদেরকে আমরা কোনো মর্যাদাই দিতাম না। তারপর আল্লাহ কুরআন নাযিল করলেন। তাদের ব্যাপারে যা নির্দেশ দিবার তা দিলেন এবং তাদের জন্য যে অংশ নির্ধারণ করার ছিল তা করলেন।"[৬৬]

সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) জাহিলী যুগের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন–

---

[৬৪] *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
[৬৫] প্রাগুক্ত
[৬৬] *সহীহ মুসলিম,* আবুল হুসাইন মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ, শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮১

Dhaka University Institutional Repository

"জাহিলী সমাজে নারী ছিল নির্যাতনের শিকার। তাদের অধিকার ও সম্পদ হরণ করা হতো, বঞ্চিত করা হতো উত্তরাধিকার হতে। তাদের তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর পরে তাদেরকে পছন্দ মতো স্বামী গ্রহণে বাঁধা দেয়া হতো। চতুষ্পদ জন্তু ও ভোগ্য সামগ্রীর মতো তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ হিসেবে মনে করা হতো।"[৬৭]

উপরিউক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলাম পূর্ব জাহিলী যুগে নারীকে কোনো অধিকারই দেয়া হয়নি। তাদেরকে শৈশবে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে এবং বার্ধক্যে সন্তানের অধীনে জীবন-যাপন করতে হতো। সারা জীবনই তারা পুরুষ অভিভাবকদের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে বাধ্য ছিল। সর্বপ্রকার অধিকার হতে নারীরা ছিল বঞ্চিত। এমনকি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিল না।

---

[৬৭] *মাযা খাসারাল আলম বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন,* আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীদের অবস্থা

মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মে নারীদেরকে অবমূল্যায়ণ করা হয়েছে। তাদের মানবিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তি সত্তাকে হরণ করা হয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীর অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হলো।

ইহুদী ধর্ম মানব জাতি সম্পর্কে যে ধারণা পেশ করে তার সারমর্ম হলো–পুরুষ সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল আর নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভন্ড। ইহুদী ধর্ম মতে, আদি পিতা হযরত আদম (আ.) জান্নাতে মহাসুখে বসবাস করছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আ.) তাঁকে প্রথমে আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁকে এমন একটি ফল খাওয়ান যা খেতে আল্লাহ তাঁকে নিষেধ করেছেন। ফলে তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন। তাই ইহুদী ধর্ম মতে, নারীর উপর সৃষ্টিকর্তার চিরন্তন অভিশাপ রয়েছে। কারণ নারী হতেই পাপের সূত্রপাত হয়।

ইহুদী সমাজে নারীর কোনো মর্যাদা ছিল বলে গণ্য করা হতো না এবং সে পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবেই বিবেচিত হতো।[৬৮] ইহুদী আইন অনুযায়ী পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারী উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। অনুরূপভাবে নারীর দ্বিতীয়বার বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হবার অধিকারও নেই।[৬৯]

---

[৬৮] *মুসলিম সভ্যতায় নারী*, এফ এম আবদুল জলীল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা, ১৯৮০, পৃ. ৩

[৬৯] *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আদালতের রায়ে তালাক হলে গোঁড়া ও রক্ষণশীল ইহুদী সমাজ তা গ্রহণ করে না। স্ত্রীকে পূর্ব-স্বামীর বিবাহিতা বলে গণ্য করে। স্বামী স্ত্রীকে 'গেট' বা বিবাহ বিচ্ছেদের সনদ না দিলে ধর্মীয় আইনে বিয়ে অটুট থাকে। সংশোধিত ইহুদী আইন ও সিভিল আইনে তার পুনরায় বিয়ে হলেও গোঁড়া ও রক্ষণশীলদের নিকট স্ত্রী ব্যভিচারিণী এবং সে বিয়ের সন্তান বংশানুক্রমে 'মামজের' বা অবৈধ সন্তান বলে গণ্য হবে। 'গেট' তাওরাতে লিপিবদ্ধ আইনেরই অংশ। ইহুদীদের বিশ্বাস এ আইন সিনাই পর্বতে আল্লাহ হযরত মূসা (আ.) কে দিয়েছিলেন।[৭০]

ইহুদী সমাজে বিয়ে ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এজন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল না। বাস্তবে এটা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশি ছিল।[৭১]

সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি জরুরি ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হতো না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না।[৭২]

ইহুদী জাতির কোনো কোনো গোষ্ঠীতে নারীকে দাসীর পর্যায়ে রাখা হয়। তার পিতা তাকে বিক্রি করে দিলেও দিতে পারে। কেবলমাত্র পুত্র সন্তান না থাকলেই কন্যা সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায়। আর জীবদ্দশায় পিতা কর্তৃক কোনো সম্পত্তি প্রদত্ত হয়ে থাকলে তাকে তা নিয়েই সন্তুষ্টি থাকতে হয়।[৭৩]

---

[৭০] *নারীর অধিকার ও মর্যাদা*, অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা, আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৯
[৭১] *নারী*, আবদুল খালেক, দীনী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮
[৭২] প্রাগুক্ত
[৭৩] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪

Dhaka University Institutional Repository

এমনিভাবে ইহুদী সমাজে নারীরা তাদের সর্বপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যুল্‌ম ও নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত ছিল।

খৃষ্ট ধর্মেও নারী সম্পর্কে অত্যন্ত অমানবিক ধ্যান-ধারণা পোষণ করা হয়েছে। খৃষ্টানরা নারীকে পাপের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে হাওয়া (আ.)-এর ভুলের কারণে নারীর রক্তে পাপের সঞ্চালন ঘটেছে।

নারী সম্পর্কে খৃষ্ট ধর্মের অনুভূতি এ ধর্মের সাধক ব্যক্তি St. Tertullion (তারতুলীন)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়–

"Do you know, that each of you in an eve; the sentence of God on this Sex of your lives in this age; the guilt must of necessity live too, you are deserter of the Divine Law; you are she who persuaded him whom the image man."

"হে নারীকুল! তোমরা কি জান যে, তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন হাওয়া। তোমাদের সম্পর্কে ঈশ্বরের বাণী এখনও প্রযোজ্য। উক্ত অপরাধ প্রবণতা এখনও তোমাদের মাঝে বর্তমান আছে, তোমরাতো শয়তানের প্রবেশ দ্বার, তোমরা সে বৃক্ষ উন্মোচনকারী, তোমরাই প্রথম স্বর্গীয় আইন ভঙ্গকারী, প্ররোচনা দানকারী, যাকে শয়তানও আক্রমন করতে সাহস পায়নি। তোমরাই বিধাতার প্রতিচ্ছবি পুরুষদের ধ্বংস করেছো।"[৭৪]

খৃষ্টান ধর্মে ধর্মের নামে নারী জাতির উপর অতীব নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে। পোপ শাসিত 'পবিত্র' রোম সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে। দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে

[৭৪] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়েছে। এতেও নারী জাতির নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। সপ্তদশ শতাব্দিতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর এক কাউন্সিল রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'Woman has no soul- নারীর কোনো আত্মা নেই।'[৭৫]

১৮০৫ সাল পর্যন্তও বৃটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময় স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেন্স। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে ৫০০ পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বললো যে, বৃটিশ আইন একশো বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের বৃটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিক্রি করা হলে সে জন্য ছয় পেন্স মূল্য নির্ধারিত ছিলো। আদালত উত্তরে বলেন যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদন্ড প্রদান করে।[৭৬]

খৃষ্টান সেন্টদের চোখে মেরী ছাড়া আর সব নারীই পাপিষ্ঠা। তারা নারীকে শয়তানের খেলার মাঠ এবং বিষ্ঠার ছালা বলে অভিহিত করেছে।

খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার ও খৃষ্টধর্মের রচয়িতা সেন্টপল বিয়েকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেন না। আর একে তিনি স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেন না। বরং তিনি (Necessary evil) জরুরি পাপ হিসেবেই বিয়ের অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি বলেন–

---

[৭৫] *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান*, শাহনাজ পারভীন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৯-৪০
[৭৬] *ইসলামী ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

"It is well for a man not touch a woman. It is well for a person to remain as he is. Do not sick marriage but if you marry. You do not sin and if a girl marries she does not sin. Yet these who marry will have worldly troubles. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the affairs of the lord, how to please the Lord; but the married man is anxious about worldly affairs how to please his wife. I say this for your won benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the lord."

কোনো নারীকে স্পর্শ না করাই পুরুষের জন্য ভালো। সে যেমন আছে, তেমন থাকাই তার জন্য উত্তম। বিয়ে করার ইচ্ছ করো না। কিন্তু তুমি বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না এবং কোনো বালিকাও বিয়েতে পাপ করে না। তবে যারা বিয়ে করে, তারা পার্থিব দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়ে। সাংসারিক উদ্বেগ হতে মুক্ত থাকো, এটাই আমি কামনা করি। অবিবাহিত পুরুষ ঈশ্বরের কাছে উদ্বিগ্ন। কিরূপে তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে। কিন্তু বিবাহিত ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে উদ্বিগ্ন, কিরূপে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে। আমি আমার নিজ কল্যাণের জন্যই এই উপদেশ দিচ্ছি, তোমার উপর কোনো বাধা আরোপের জন্য নয়, বরং শৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রভুর প্রতি তোমার অবিভক্ত অনুরক্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই আমি এটা বলছি।"[৭৭]

হিন্দু ধর্মেও দাসত্ব ও পরাধীনতার কবলে নারীর স্বকীয়তা ও আত্মমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা 'মনু' কর্তৃক সংকলিত মনুসংহিতায় নারী সম্পর্কে বলা হয়েছে–

---

[৭৭] *Bible-1; কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

Dhaka University Institutional Repository

"নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোকনা কেন স্বাধীন যেন না হয়। শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে থাকবে স্বামীর অধীনে আর বিধবা হওয়ার পর থাকবে পুত্রের অধীনে। কোনো সময়ই সে স্বাধীন থাকবে না।"[৭৮]

হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী বেদ নারীর জন্য নিষিদ্ধ। ভারতে নারীকে যে স্বতন্ত্র সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করা হতো না, সতীদাহ প্রথাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হতো।[৭৯]

হিন্দু ধর্মে যুবতী নারীকে দেবতার উদ্দেশ্যে দেবতার সন্তুষ্টির জন্য কিংবা বৃষ্টি অথবা ধনদৌলত লাভের জন্য বলিদান করা হতো। একটি বিশেষ গাছের সামনে এভাবে নারীকে পেশ করা ছিল তদানীন্তন ভারতের স্থায়ী রীতি। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সহমৃত্যু বরণ বা সতীদাহ রীতিও পালন করতে হতো হিন্দু নারীকে।[৮০] হিন্দু ধর্ম মতে– মৃত্যু, নরক, বিষ, সর্প এবং আগুন এর কোনটিই নারী অপেক্ষা খারাপ বা মারাত্মক নয়। [৮১]

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সমাজের হীন ও অশুভ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ধর্মের শিক্ষা হলো নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা যায় না। বিয়ে ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্যকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থি। এর লক্ষ্য হল সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। তাই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্ত আবশ্যক।[৮২]

---

[৭৮] *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
[৭৯] *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
[৮০] *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬২-৬৩
[৮১] *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
[৮২] *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

একদিন বুদ্ধের এক শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– 'নারী জাতির সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?' বুদ্ধ উত্তরে বললেন– 'নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থি।' অন্য এক কথায় তিনি আরো বলেন– 'নারীদের সাথে কোনোরূপ মেলামেশা করো না এবং তাদের প্রতি কোনো অনুরাগ রেখো না। আর তাদের সাথে কথাবার্তাও বলোনা। কেননা পুরুষের পক্ষে নারী ভয়ঙ্কর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গি দ্বারা পুরুষের বিশ্বাস-ধন লুট করে নেয়। নারী একটি সশরীরী ছলনা মাত্র। সুতরাং নারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করো।'[৮৩]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে যেয়ে বেটনী (Bettany) তাঁর 'World's Religions' গ্রন্থে বলেন–

"Unfathomably deep, like a fish's course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie."

"পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হলো তেমনি নিবিড় যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া দুস্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্য সদৃশ এবং সত্য মিথ্যার মতোই।"[৮৪]

বৌদ্ধ ধর্মে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য পন্থা বলা হয়নি। এখানে কন্যা কর্তা কন্যাকে উপদেশ দেন স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতে।[৮৫]

---

[৮৩] *কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৮৪] *The World Religions*, Bettany G.T, London, 1890, P. 664

[৮৫] *ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান*, মমতাজ দৌলতানা, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১১৪

Dhaka University Institutional Repository

গৌতুম বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা হলো, নারীর সঙ্গে বসবাসকারী পুরুষ পরকালের মুক্তি হতে বঞ্চিত থাকবে। নারীরা পুরুষের মোক্ষ লাভের অন্তরায়। তাদের সাহচর্যে থেকে আত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই গৌতম বুদ্ধ বিয়ে প্রথার বিরোধী ছিলেন। তিনি মানুষকে সন্ন্যাসব্রতের প্রতি আহবান করে গিয়েছেন।

প্রাচীন গ্রীক সমাজে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইন সম্পর্কিত অধিকার, সামাজিক আচার এসব দিক দিয়ে নারীর মর্যাদা অত্যন্ত হীন ছিল। যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যে তারা চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল, তবুও নারী প্রজন্মকে তারা মানবতার জন্য একটা দুঃসহ বোঝা মনে করতো। সমাজে তারা এতো ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হতো। আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মতো। বাজারে তাঁর বেচা-কেনা চলতো।[৮৬]

গ্রীক পুরাণে কল্পিত নারী 'পান্ডোরাকে' সামাজিক অস্থিরতা, নিষ্ঠুরতা, দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসেবে মনে করা হয়। যেভাবে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে ইহুদী পুরাণে মানবতার দুঃখ-দুর্দশার জন্য দায়ী করা হয়েছে। হযরত হাওয়া (আ.) সম্পর্কিত কল্পিত মিথ্যা কাহিনী ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের রীতি নীতি, আইন-কানুন, সামাজিক ক্ষেত্রে, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতিকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে।[৮৭]

গ্রীক সভ্যতার যেসব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠতো, সেখানে তাঁর কোনোই স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারাজীবন তারা পুরুষের দাসীবাদীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের

---

[৮৬] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সামাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৮৭] *পর্দা ও ইসলাম*, মওদূদী, অনুবাদ- আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের ইচ্ছাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো।[৮৮]

গ্রীক পুরাণে আছে, কামদেবী জনৈক দেবতার পত্নী হয়ে অন্য তিন দেবতা ও একজন মানবের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এসম্পর্কের ফলে যে সন্তান জন্ম হলো, পরবর্তীতে সেই কামদেব (কিউপিড) নামে অভিহিত হয়। এ কামদেব গ্রীকদের উপাস্য ছিল।[৮৯]

গ্রীক সমাজে বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকারও নারীকে দেয়া হতো না। বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো। যেমন কোনো নারী যখন তালাক চাওয়ার জন্য আদালতে যেতো, তখন স্বামী পথিমধ্যে ওঁত পেতে থাকতো এবং তাকে পাওয়া মাত্র পাকড়াও করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতো।[৯০]

প্রাচীন রোমান সভ্যতায়ও নারীর সামাজিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল খুবই নাজুক। রোমানরা স্ত্রীকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু বলে মনে করতো। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। পুরুষেরা থাকতো শাসকের ভূমিকায় এবং তারাই থাকতো সর্বেসর্বা। স্ত্রী কোনো অপরাধ করলে এ বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে পারতো।[৯১]

রোমান সমাজে পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য স্ত্রী প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্ত র্ভূক্ত ছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের তার উপর আইনানুগ অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হতো।[৯২]

---

[৮৮] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত
[৮৯] *ইসলাম ও নারী*, ফাতিমা আলী, মাসিক মদীনা, জুন-১৯৯৫, পৃ. ১০
[৯০] *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত
[৯১] *ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[৯২] *নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

রোমানদের ধারণায়– নারীদের কোনো রূহ বা আত্মা নেই। তাই তাদের উপর নৃশংস নির্যাতন চালানো হতো। তাদের শরীরে গরম তেল ঢেলে দেয়া হতো, তাদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হতো, এমনকি ঘোড়ার খুরের সাথে তাদেরকে বেঁধে দ্রুত ঘোড়াকে দৌড়ানো হতো ঐ নারীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত।[৯৩]

নারীদেরকে সমাজের দায়িত্বপূর্ণ কোনো পদের উপযুক্ত মনে করা হতো না। অবাধ যৌনাচার ও নৈতিক অধঃপতন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছিল। বেশ্যাবৃত্তি ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফ্লোরা (Flora) নামে একটি ক্রীড়ালয়ে উলঙ্গ নারীদের দৌড় প্রতিযোগিতা হতো।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটা সুস্পষ্টভাবে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী সকল ধর্ম ও সভ্যতার কোনো একটিতেও নারীকে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়নি। বরং তাকে পাপের উৎস, লাঞ্ছনা ও হীন মনে করা হয়েছে। শোষণ, নিপীড়ন, সীমাহীন অত্যাচার-নির্যাতনের বন্দিশালায় আবদ্ধ রাখা হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী যে একটি প্রাণী, তার যে প্রাণ আছে একথাটি স্বীকার করা হতো না। তাকে গৃহের অন্যান্য আসবাবপত্রের মতোই নির্জীব পদার্থ বলে গণ্য করা হতো। শিক্ষা-দীক্ষা এবং সর্বপ্রকার স্বাধিকার হতে তারা চির বঞ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে শান্তি ও মানবতার পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ইসলাম নারীকে তার যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে।

---

[৯৩] *আল্‌বাসূল ইসলামী*, লক্ষ্ণৌ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪৪ বর্ষ, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪২০ হিজরী, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভূমিকা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ অন্যান্য নবী পত্নীগণের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মহানবী (স.) কে যারা পারিবারিক জীবনে সার্বিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং নবী কারীম (স.)-এর পারিবারিক জীবনের আদর্শের বর্ণনা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যারা অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন তাঁরা হলেন- 'আযওয়াজে মুতাহহারাত।' তাঁরা ছিলেন মুসলিম নারীদের জন্য আদর্শ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে 'উম্মাহাতুল মু'মিনীন' বা মুমিনদের মা বলে সম্বোধন করেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা উপস্থাপন করা হল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভূমিকা

মহানবী (স.)-এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)। নাম খাদিজা। কুনিয়াত উম্মু হিন্দ। উপাধি তাহিরাহ। বংশনামা হল– খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদুল উজ্জা ইব্ন কুসাই। মাতার নাম ফাতিমা বিন্ত যায়িদা। তিনি আমের ইব্ন লুব্বীর বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।[৯৪]

ইসলাম পূর্ব যুগেই খাদীজা (রা.) 'তাহিরাহ' উপাধি লাভ করেন। পুত:পবিত্র চরিত্রের জন্য তিনি এ উপাধি পান। রাসূল (স.) ও খাদীজা (রা.)-এর মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল।

---

[৯৪] *মহিলা সাহাবী*, তালিবুল হাশেমী, অনুবাদ-আবদুল কাদের, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা-২০১০, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাদীজা (রা.) 'আমুল ফীল' বা হাতির বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি ভদ্র প্রকৃতির ছিলেন। বয়োপ্রাপ্ত হলে আবু হালা হিন্দা ইব্ন যুরারা আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। ইসলাম পূর্ব যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর আতীক ইব্ন আবিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। দ্বিতীয় স্বামী আতীকের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তারপর রাসূল কারীম (স.) কে বিয়ে করেন।[৯৫]

কুরাইশ বংশের অনেকের মতো হযরত খাদীজা (রা.)ও একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবনে সা'দ তাঁর ব্যবসা সম্পর্কে বলেন– 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়ায় যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সব পণ্যের সমপরিমাণ হতো।' এ মন্তব্য দ্বারা হযরত খাদীজা (রা.)-এর ব্যবসায়ের পরিধি অনুমান করা যায়।[৯৬]

হযরত খাদীজা (রা.)-এর ব্যবসা একদিকে সিরিয়া এবং অন্যদিকে সমগ্র ইয়েমেনে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিরাট বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তিনি বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কারণে তার ব্যবসা ক্রমাগত উন্নতির দিকে এগিয়ে চলছিল। এ সময় তিনি একজন অসাধারণ যোগ্য ও বিশ্বস্ত লোকের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) তখন ২৪/২৫ বছরের যুবক। তাঁর সততার কারণে মক্কাবাসীর কাছে তিনি আল-আমিন হিসেবে পরিচিতি পান। হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট এই পবিত্র ব্যক্তির কথা না পৌঁছাটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। বিশেষ করে তাঁর ছোট ভাই বউ সাফিয়্যার কাছে 'আল-আমিন' সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত শুনেছেন। তিনি স্বীয় ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই ধরণের সৎলোকের সন্ধানেই ছিলেন। তাই তিনি পণ্য সিরিয়ায় পাঠানোর দায়িত্ব নেয়ার জন্য মুহাম্মদ (স.) কে প্রস্তাব পাঠান। মুহাম্মদ (স.) চাচা আবূ তালিবের পরামর্শে হযরত

---

[৯৫] *আনসাবুল আশরাফ,* আবুল হাসান আল-বালাযুরী, দারুল মা'আরিফা, মিসর, পৃ. ৪০৭

[৯৬] *সিয়ারু আলা'ম আন-নুবালা,* শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মুওয়াস্সারাতুল রিসালা, বৈরূত-১৯৪২,পৃ. ৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

খাদীজার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সিরিয়া রওয়ানা হয়ে গেলেন। এ কাফেলায় খাদীজা (রা.) স্বীয় গোলাম মাইসারাকে রাসূল (স.)-এর সঙ্গে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, সফরকালে যেন মুহাম্মদ (স.)-এর কোন কষ্ট না হয়।

এ সম্পর্কে হযরত ইয়া'লার বোন নাফীসা বিন্‌ত মুনইয়া বলেন– রাসূল কারীম (স.) যখন ২৫ বছরে পর্দাপন করেছেন, তখন চাচা আবূ তালিব একদিন তাঁকে ডেকে বললেন– ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, তাছাড়া সময়টাও আমাদের জন্য খুব সঙ্কটজনক। আমাদের কোন ব্যবসা বা অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি তার নিকট গেলে হয়তো তোমাকে সে নির্বাচন করতো। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা সম্পর্কে সে অবহিত। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করি না এবং ইহুদিদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশংকা করি। তবুও এমনটি না করে উপায় নেই। উত্তরে রাসূল কারীম (স.) বললেন– হয়তো সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবূ তালিব বললেন– সম্ভবত অন্য কাউকে সে নিয়োগ দিয়ে ফেলবে। বিষয়টি খাদীজার কাছেও পৌঁছল। তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন– অন্যরা আপনাকে যে পারিশ্রমিক দিবে, আমি তার দ্বিগুণ দিব।[৯৭]

রাসূল কারীম (স.)-এর বিশ্বস্ততার কারণে সব পণ্য দ্বিগুন লাভে বিক্রি হয়ে গেল। কাফেলা যখন মক্কায় ফিরে এলো তখন মাইসারা অত্যন্ত সততার সাথে মুহাম্মদ (স.)-এর যাবতীয় কর্মকান্ড ও দ্বিগুন মুনাফার বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন খাদীজা (রা.)-এর কাছে পেশ করেন। মাইসারা আরো বলেন– 'আমি তার সাথে খেতে বসতাম। আমাদের পেট ভরে যেত, অথচ অধিকাংশ খাবার পড়ে থাকতো।'[৯৮]

---

[৯৭] *আত্-তাবাকাতুল কুবরা,* ইবনে সাদ, দারুল ফিকর, বৈরূত, পৃ. ১২৯

[৯৮] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাদীজা (রা.) ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমতি ও দৃঢ়চেতা ভদ্রমহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ, ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল।[৯৯] মাইসারার মুখে মুহাম্মদ (স.) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরে খাদীজা (রা.) অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হলেন এবং স্বীয় দাসী নাফীসার মাধ্যমে মুহাম্মদ (স.)-এর নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান।

রাসূল কারীম (স.) খাদীজার প্রস্তাবের কথা চাচাদের বললেন। তিনি তাঁর দুই চাচা আবূ তালিব ও হামযাকে সঙ্গে করে খাদীজার গৃহে যান। খাদীজা (রা.) চাচা আমর ও খান্দানের লোকদেরও ডাকেন। আবূ তালিব বিয়ের খুত্‌বাহ পাঠ করে খাদীজার সাথে রাসূল (স.)-এর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন এবং ৫০০ দিরহাম মাহর নির্ধারিত হলো। সে সময় রাসূল (স.)-এর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর।[১০০]

বিয়ের পর রাসূল কারীম (স.) প্রায়ই ঘরের বাইরে কাটাতে লাগলেন। একাধারে কয়েকদিন মক্কার পাহাড়ে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতেন। এভাবে ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় বিয়ের ১৫ বছর পর হেরা গুহায় মুহাম্মদ (স.) নবুওয়্যাত লাভ করেন, তিনি খাদীজা (রা.) কে সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবহিত করেন। পূর্ব হতেই হযরত খাদীজা (রা.) স্বামী মুহাম্মদ (স.)-এর নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। জামি' আল-বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। "উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (স.)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওহী এসেছিল তা ছিল সত্য স্বপ্ন। প্রত্যক্ষভাবে ওহী আসার পূর্ব হতেই তিনি নবুওয়্যাত সম্পর্কে স্বপ্নে দেখতেন। তিনি রাতে যে স্বপ্ন দেখতেন তার তাৎপর্য ভোরের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে দেখা যেত। এরপর রাসূল (স.)-এর নিকট নির্জনতা পছন্দ ছিলো। তাই তিনি হেরা

---

[৯৯] *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১০০] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে শুরু করেন এবং একাধারে অনেকদিন বাড়ি ফিরে না এসে তথায় অবস্থান করে ইবাদাত করতেন। যাওয়ার সময়ে খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যেতেন। কিছুদিন ইবাদাত করার পর বাড়িতে ফিরে আসতেন। আবার প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী নিয়ে হেরা গুহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতেন।

হেরা গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট বাস্তব সত্য প্রকাশ পেল। অত:পর হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ (স.)! পড়ুন, রাসূল (স.) উত্তরে বললেন, আমি তো পড়তে পারিনা। এরপর জিবরাঈল (আ.) তাকে জড়িয়ে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে, তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ুন। রাসূল (স.) উত্তরে আবার বললেন, আমি পড়তে পারি না। তখন আগত ফিরিশতা হযরত জিবরাঈল (আ.) দ্বিতীয়বার রাসূল (স.) কে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। তিনি এতেও চরম কষ্ট পেলেন। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং পুনরায় বললেন, পড়ুন। রাসূল (স.) আবারো বললেন, আমি পড়তে জানি না। ফিরিশতা তৃতীয় বার রাসূল (স.) কে ধরে আলিঙ্গন করার পর বললেন–

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الإِنسَانَ

مَا لَمْ يَعْلَمْ

"পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড থেকে। পড়ুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।"

এবার রাসূল (স.) ফিরিশ্তার সাথে পড়লেন। রাসূল (স.) ভীত ভগ্ন হৃদয় নিয়ে এ আয়াতগুলোসহ বাড়িতে ফিরলেন ও স্ত্রী খাদিজা বিন্ত খুয়াইলিদের নিকট এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করে দাও। তিনি ঢেকে দিলেন। কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.)-এর ভয় কেটে গেল এবং শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। পরে তিনি হযরত খাদীজা (রা.)-এর নিকট বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন। তিনি আরো বলেন, হে খাদীজা! আল্লাহর

Dhaka University Institutional Repository

শপথ করে বলছি, আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। খাদীজা (রা.) রাসূল কারীম (স.)-এর কথা শুনে বললেন– না, তা কক্ষনো হতে পারে না। আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে অপমানিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথি পরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।

অত:পর হযরত খাদীজা (রা.) রাসূল কারীম (স.)কে তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইব্ন নাওফিলের কাছে নিয়ে যান। জাহিলী যুগে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি তাওরাত, যাবুর ও ইনজীল কিতাবের একজন বড় আলেম। তখন তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। হযরত খাদীজা (রা.) বললেন, শুনুনতো আপনার ভাতিজা কি বলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা তোমার কী হয়েছে? রাসূল (স.) বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা ঘটনা শুনেই বলে উঠলেন– 'এতো সেই জিবরাঈল (আ.) যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। আফসোস! সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকতাম, যখন তোমার জাতি তোমাকে তোমার দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।' রাসূল কারীম (স.) জিজ্ঞেস করলেন, এসব মানুষ কি আমাকে দেশ হতে বহিস্কার করবে? তিনি বললেন– 'হ্যাঁ, তোমার ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা কারো উপর অবতীর্ণ হলে সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে যায়। আমি যদি সে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে তোমাকে আমি পুরোপুরি সাহায্য করবো।'[১০১]

এ ঘটনার পর কিছুদিনের মধ্যেই ওয়ারাকা পরলোকগমন করেন। হযরত খাদীজা (রা.) নির্দ্বিধায় মহানবী (স.)-এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম

---

[১০১] *সহীহ আল-বুখারী,* মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরূত, বাবু কাইফা কানা বাদউল ওহী, ১ম খন্ড, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেন। ইমাম যুহরী বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন।

রাসূল (স.)-এর নিকট প্রথম ওহী লাভের পর বেশ কিছুদিন ওহী আসা বন্ধ ছিল। রাসূল (স.) খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি হেরা গুহায় যেতে থাকেন। এসময় একদিন রাসূল (স.) হযরত জিবরাঈল (আ.)কে দেখতে পেলেন এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হযরত খাদীজা (রা.)-এর কাছে দ্রুত ফিরে আসেন। খাদীজা (রা.)কে বলেন– আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও। খাদীজা (রা.) কম্বল দিয়ে ঢেকে দেন। এ অবস্থায় সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির নাযিল হয়।[১০২]

হযরত খাদীজা (রা.) এ সময় একদিন পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি রাসূল কারীম (স.)কে জিজ্ঞাসা করলেন– 'আপনার কাছে যে ফিরিশতা আসেন, তিনি কোন সময় আগমন করেন তা কি বলতে পারেন।' তিনি বললেন- হ্যাঁ। খাদীজা (রা.) বললেন– 'এবার তিনি যখন আসবেন দয়া করে তা আমাকে জানাবেন।' তারপর জিবরাঈল (আ.) রাসূল (স.)-এর কাছে যখন আগমন করলেন, তখন হযরত খাদীজা (রা.) কাছেই ছিলেন, রাসূল কারীম (স.) তাকে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর উপস্থিতির কথা জানালেন। খাদীজা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছেন কি না? রাসূল (স.) যখন বললেন যে, তিনি জিবরাঈল (আ.)কে নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছেন, তখন খাদীজা (রা.) তাঁকে তাঁর কোলে বসতে বললেন। রাসূল (স.) তাই করলেন। তখন খাদীজা (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তিনি জিবরাইল (আ.)কে দেখতে পাচ্ছেন কিনা? তখন রাসূল (স.) জানালেন– হ্যাঁ। খাদীজা (রা.) তাঁকে তাঁর বাহু জড়িয়ে বসতে বললেন এবং রাসূল (স.) তাই করলেন। খাদীজা (রা.) তখন প্রশ্ন করলেন যে, তিনি জিবরাঈল (আ.)কে দেখতে পাচ্ছেন কিনা? রাসূল (স.) বললেন– হ্যাঁ। তখন খাদীজা (রা.) তাঁর মাথা উন্মুক্ত করলেন ও মাথার রুমাল

---

[১০২] *আনসাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

Dhaka University Institutional Repository

ফেলে দিলেন। রাসূল (স.) তখনো তাঁর বাহু জড়িয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- 'আপনি কি এখনো তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন?' রাসূল (স.) জবাব দিলেন– না। তখন খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন– ইনি শয়তান নন, ফিরিশ্‌তা। কারণ এ অবস্থায় ফিরিশ্‌তা নিশ্চয় লজ্জা পাবে।[১০৩]

মহানবী (স.) একদিন হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁর খাবার-দাবার ফুরিয়ে গেলেও তিনি গুহা ছেড়ে খাদ্য আনার জন্য যেতে অনাগ্রহী। আগে খাদীজা (রা.) নিজেই তাঁর জন্য গুহায় খাবার নিয়ে আসতেন। এসময় হযরত জিবরাঈল আগমন করলেন। রাসূল (স.)কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! গোশতের ঝোল ভরা পাত্র নিয়ে খাদীজা আপনার কাছে আসছেন। তিনি এসে পৌঁছলে তাঁর প্রভু (আল্লাহ) এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং সুসংবাদ দেবেন যে, জান্নাতে তাঁর জন্য রয়েছে বিশাল এক মুক্তার (কাসাব) গৃহ যেখানে কোন অশান্তি বা ক্লান্তি থাকবে না।'[১০৪]

রাসূল (স.) নবুওয়্যাত লাভের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। মুসলমানদের সুন্দর স্বভাবের কারণে কিছু লোক আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ শুরু করেন। ইসলামের ব্যাপকতায় খাদীজা (রা.) খুবই আনন্দিত হতেন এবং তিনি অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ ও উপহাসকে উপেক্ষা করে নিজেকে রাসূল (স.)-এর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে প্রমাণ করতে লাগলেন। তিনি সমস্ত ধন-সম্পদ ইসলামের জন্য ও ইয়াতিম বিধবাদের উন্নতি, অসহায়দের সাহায্য ও অভাবগ্রস্তদের অভাব দূরীকরণে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।[১০৫]

---

[১০৩] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[১০৪] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৬৮

[১০৫] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

কাফিরদের বিভিন্ন নির্যাতনে যখন রাসূল কারীম (স.) যে ব্যথা অনুভব করতেন, হযরত খাদীজা (রা.)-এর দ্বারা আল্লাহ তা দূর করে দিতেন। কারণ রাসূল (স.) যখনই বিমর্ষ অবস্থায় বাড়িতে ফিরতেন, খাদীজা (রা.) সহানুভূতির সাথে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন ও সাহস যোগাতেন। হযরত খাদীজা (রা.) বলতেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দুঃখিত হবেন না, এমন কোন রাসূল কি আজ পর্যন্ত আগমন করেছেন, যাঁকে নিয়ে মানুষ উপহাস করেনি?' হযরত খাদীজা (রা.)-এর এ কথায় রাসূল কারীম (স.)-এর দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যেত। মোটকথা, সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে হযরত খাদীজা (রা.) রাসূল কারীম (স.)-এর প্রতিটি বিপদ-আপদে তাঁকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।[১০৬]

হযরত মুহাম্মদ (স.)ও খাদীজা (রা.)কে গভীরভাবে ভালবাসতেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পরও আজীবন তার স্মৃতি ও তাঁর অবদান মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাননি। হযরত আয়িশা (রা.) বলেন– 'আমি হযরত খাদীজা (রা.) কে দেখিনি, তা সত্ত্বেও তাঁকে যে পরিমাণ ঈর্ষা করতাম, রাসূল (স.)-এর অন্য কোন স্ত্রীকে সে পরিমাণ ঈর্ষা করিনি। কারণ রাসূল কারীম (স.) খুব বেশি বেশি তাঁকে স্মরণ করতেন। তিনি যখনই কোন ছাগল জবাই করতেন, তার কিছু অংশ কেটে খাদীজা (রা.)-এর বান্ধবীদের কাছে পাঠাতেন। আমি যদি বলতাম দুনিয়াতে যেন খাদীজা ছাড়া আর কোন নারী নেই। তিনি বলতেন, খাদীজা (রা.) এমন ছিল, এমন ছিল। তাঁর থেকেই আমি সন্তান লাভ করেছি।'[১০৭]

'হযরত আয়িশা (রা.) আরো বলেন– 'আল্লাহর রাসূল (স.) একবার হযরত খাদীজা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করলেন। আমি সামান্য কটূক্তি করে বললাম– তিনি তো একজন বৃদ্ধা। তাছাড়া এমন এমন। আল্লাহ তাঁর পরিবর্তে উত্তম নারী আপনাকে দান করেছেন। তখন রাসূল কারীম (স.) বললেন– আল্লাহ তাআলা তাঁর চেয়ে উত্তম নারী আমাকে দান করেননি। মানুষ যখন আমাকে মানতে অস্বীকার করেছে, তখন সে আমার প্রতি ঈমান

---

[১০৬] প্রাগুক্ত

[১০৭] *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

এনেছে। মানুষ যখন বঞ্চিত করেছে, তখন সে তাঁর সম্পদে আমাকে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তাঁর সন্তান আমাকে দান করেছেন এবং অন্যদের সন্তান থেকে বঞ্চিত করেছেন। আমি বললাম– আমি আর কক্ষণও তাঁকে নিয়ে আপনাকে তিরস্কার করবো না।'[১০৮]

আর একদিন আল্লাহর রাসূল (স.)-এর মুখে হযরত খাদীজা (রা.)-এর প্রশংসা শুনে হযরত আয়িশা (রা.) বলেন- আল্লাহ তো এই বৃদ্ধা নারীর পরিবর্তে আপনাকে অন্য নারী দান করেছেন। একথা শুনার পর রাসূল কারীম (স.) ভীষণ রেগে যান। হযরত আয়িশা (রা.) অনুতপ্ত হয়ে মনে মনে বলেন– হে আল্লাহ! তুমি যদি রাসূল (স.)-এর রাগ দূর করে দাও, তবে আর কক্ষনো হযরত খাদীজা (রা.) সম্পর্কে কোন মন্দ কথা উচ্চারণ করবো না। আল্লাহর রাসূল (স.) হযরত আয়িশা (রা.)-এর মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন– তুমি এমন কথা কি করে বলতে পার? মানুষ যে সময় আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন খাদীজা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।[১০৯]

হযরত খাদীজা (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (স.)-এর বহু বাণী হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল।

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল কারীম (স.) ইরশাদ করেছেন– 'বিশ্বের নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম হলেন– মারইয়াম, আসিয়া, খাদীজা বিন্ত খুওয়াইলিদ ও ফাতিমা।'[১১০]

হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি–

خير نسائها خديجة بنت خويلد وخير نسائها مريم ابنة عمران

---

[১০৮] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[১০৯] প্রাগুক্ত

[১১০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

"খাদীজা বিন্‌তে খুওয়াইলিদ তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী। মারইয়াম বিন্‌ত ইমরান তাঁর সময়ের সর্বোত্তম নারী।"[১১১]

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (স.)কে বলতে শুনেছি–

كَانَتْ خَدِيجَةُ خَيْرَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

'খাদীজা (রা.) জগতের সর্বোত্তম নারী।'[১১২]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল কারীম (স.) ইরশাদ করেন–

سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيجَةُ وَآسِيَةُ

'মারইয়াম বিন্‌ত ইমরানের পর ফাতিমা, খাদীজা ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া জান্নাতের অধিবাসী মহিলাদের নেত্রী।'[১১৩]

ইমাম যাহাবী (র.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– "তাঁর ফযীলত অনেক, তিনি তাঁর সময়ের সকল নারীর নেত্রী। যে সকল নারী বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় পূর্ণতা লাভ করেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী এক ভদ্রমহিলা। তিনি জান্নাতের অধিকারিণী। নিজের ধন-সম্পদ রাসূল কারীম (স.)-এর জন্য ব্যয় করেছেন। আর রাসূল কারীম (স.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর মাধ্যমে তাঁকে জান্নাতে মণি-মুক্তার তৈরি

---

[১১১] *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, মুহিউদ্দিন ইব্‌ন শারফ আন-নববী, আত-তিবায়া আল মুগীরিয়া, মিসর, পৃ. ৩৪১।

[১১২] *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

[১১৩] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

একটি বাড়ির সুসংবাদ দান করেছেন।"[১১৪]

হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালের সঠিক সন সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত খাদীজা (রা.)-এর ভাতিজা হাকীম ইব্ন হিযাম বলেন- আমরা তাঁকে ঘর থেকে উঠিয়ে নিয়ে 'হাজূন' এ দাফন করি। নবী কারীম (স.) তাঁর কবরে নামেন। তাঁর ইনতিকাল হয় নবুওয়্যাতের দশম বছর রমযান মাসে। তখন তাঁর বয়স পঁয়ষট্টি বছর।[১১৫]

হযরত আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত– হযরত খাদীজা (রা.) নামায ফরয হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেন।[১১৬] কাতাদা ও উরওয়া বলেছেন– হিজরাতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করেন।

চাচা আবূ তালিব ও প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালের পর রাসূল (স.)-এর জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হয়। রাসূল (স.) নিজেই তাদের ইন্তিকালের বছরকে 'আমুল হুয্ন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত করেন। এ সময় কুরাইশরা অতি নির্দয়ভাবে রাসূল (স.)-এর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন চালাতে থাকে। ইব্ন ইসহাক বলেন– হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর রাসূল (স.)-এর উপর একের পর এক বিপদ আসতেই থাকে।[১১৭]

---

[১১৪] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত পৃ. ১০৯-১১০

[১১৫] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত পৃ. ৪০৬

[১১৬] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[১১৭] *তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম,* শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, মাকতাবুল কুদসী, কায়রো, ১৩৬৭ হি, পৃ. ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিছেদ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা

হযরত আয়িশা (রা.) রাসূল কারীম (স.)-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর পিতার নাম আবূ বকর সিদ্দীক ইব্ন আবী কুহাফা ইব্ন আমির ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তাইম ইব্ন মুর্‌রাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াঈ। মাতার নাম উম্মু রূমান বিন্‌ত উমাইর ইব্ন আমির ইব্ন দাহমান ইবনুল হারিস ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন কিনান।[১১৮] রাসূলুল্লাহ (স.) ও হযরত আয়িশা (রা.)-এর বংশধারা পিতৃকূলের দিক দিয়ে উপরের দিকে ৭ম/৮ম পুরুষে এবং মাতৃকূলের দিক দিয়ে ১১শ/১২শ পুরুষে মিলিত হয়েছে।[১১৯]

হযরত আয়িশা (রা.)-এর উপাধি ছিল সিদ্দীকা এবং হুমাইরা। তিনি খুব ফর্সা সুন্দরী ছিলেন বিধায় তাঁকে 'আল-হুমাইরা' বলা হতো।[১২০]

তার কুনিয়াত বা উপনাম ছিল উম্মু আবদিল্লাহ। আবদুল্লাহ ছিলেন হযরত আয়িশা (রা.)-এর বোন আসমা (রা.)-এর ছেলে, হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন নি:সন্তান। তিনি রাসূল কারীম (স.)কে বললেন– আপনার অন্য স্ত্রীগণ তাঁদের পূর্বের স্বামীদের সন্তানদের নামে নিজেদের কুনিয়াত ধারণ করে, আমি কার নামে কুনিয়াত ধারণ করব? রাসূল (স.) বললেন– তোমার বোনের ছেলে আবদুল্লাহর নামে। সেদিন থেকেই তাঁর কুনিয়াত হয় উম্মু আবদিল্লাহ।[১২১]

---

[১১৮] *আসমাউস সাহাবা আর-রুয়াত,* ইব্ন হাযম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২, পৃ.৩৯-৪০

[১১৯] *উসুদুল গাবা ফী মা'আরিফাতিস সাহাবা,* আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল আসীর, দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল আরাবী, ৫ম খন্ড পৃ. ৫৮৩

[১২০] *আসসিদ্দীকা বিন্‌ত আস সিদ্দীক,* আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, নাহযা, মিশর, ১৯৯৬, পৃ. ৩২

[১২১] *সুনান আবু দাউদ,* আবু দাউদ সিজিস্তানী, আসমাহুল মাতাবি, দিল্লী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৭৯; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ই.ফা.বা, ঢাকা, ১৯৮৬, ১ম খন্ড, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশা (রা.) কবে জন্মগ্রহণ করেন সে সম্পর্কে তারিখ ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলীতে তেমন কিছু পাওয়া যায় না। এজন্য তাঁর জন্ম সন সম্পর্কে বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে হযরত আয়িশা (রা.)-এর বয়স সম্পর্কে কয়েকটি কথা সর্বসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তা হলো হিজরাতের তিন বছর পূর্বে ছয় বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে নয় বছর বয়সে স্বামী গৃহে যান এবং এগার হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হন। এ হিসাবে তাঁর জন্মের সঠিক সময়কাল হবে নবুওয়্যাতের পঞ্চম সন। অর্থাৎ হিজরত পূর্ব নবম সনের শাওয়াল মাসে/জুলাই ৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১২২]

হযরত আয়িশা (রা.) কখন কিভাবে মুসলমান হন সে সম্পর্কে বিশেষ কোন ঘটনার অবতারণা হয়নি। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশেই তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন। কারণ তারই পিতৃগৃহে সর্বপ্রথম ইসলামের আলো প্রবেশ করে। ফলে হযরত আয়িশা (রা.) মুহূর্তের জন্যও কাফির ও মুশরিক অবস্থায় দিন অতিবাহিত করেননি। এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.) নিজেই বলেন– 'যখন থেকে আমি আমার পিতা-মাতাকে চিনেছি তখন থেকেই তাঁদেরকে মুসলমান পেয়েছি।'[১২৩]

শৈশব থেকেই হযরত আয়েশা (রা.)-এর মধ্যে এমন সব গুনাবলী পরিলক্ষিত হয় যা পরিণত বয়সে তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাক্ষ্য বহন করে।

খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর রাসূল কারীম (স.) মানসিকভাবে অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন, রাসূল (স.) কে বিমর্ষ দেখে উসমান ইবনে মাজ'উনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম তাঁকে পূনরায় বিয়ে করার পরামর্শ দেন। রাসূল (স.) বললেন– কাকে? খাওলা বিন্ত

---

[১২২] *সীরাতে আয়িশা,* সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী, মাকতাবা মাদানীয়া, লাহোর, পৃ. ২১

[১২৩] *সহীহ আল বুখারী,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

হাকীম বললেন– বিধবা ও কুমারী দুই রকম পাত্রীই আছে। যাকে আপনার পছন্দ হয় তাঁর বিষয়ে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (স.) তাঁদের পরিচয় জানতে চাইলেন। খাওলা বিন্ত হাকীম বললেন- বিধবা পাত্রীটি সাওদা বিন্ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রীটি আয়িশা বিন্ত আবী বকর। রাসূল (স.) বললেন– ভালো, তুমি তাঁর (আয়িশা) সম্পর্কে কথা বলো।[১২৪] কারণ বিয়ের পূর্বেই তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে এর ইঙ্গিত লাভ করেছিলেন। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে, এক ব্যক্তি কোন একটি জিনিস এক টুকরো রেশমে জড়িয়ে তাঁকে দেখিয়ে বলছেন, এটি আপনার। তিনি খুলে দেখেন তার মধ্যে আয়িশা (রা.)।[১২৫]

রাসূল কারীম (স.)-এর সম্মতি পেয়ে খাওলা বিন্ত হাকীম প্রথমে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাড়ি এসে প্রস্তাব দেন। হযরত আবূ বকর (রা.) প্রস্তাব মেনে নেন এবং খাওলা বিন্ত হাকীমকে বলেন, রাসূল (স.) কে নিয়ে আসতে।[১২৬] রাসূল (স.) এলেন এবং আবূ বকর (রা.) নিজে বিয়ে পড়িয়ে দেন।

খুব সাদাসিধাভাবে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়। তিনি নিজেই বলেন– রাসূলুল্লাহ (স.) যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতাম। আমি এ বিয়ে সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। ইত্যবসরে আমার পিতা আমাকে বাইরে বেরুনো নিষেধ করে দিলেন।[১২৭]

বিয়ের পর হযরত আয়িশা (রা.) প্রায় তিন বছর পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ২ বছর ৩ মাস মক্কায় এবং ৭/৮ মাস হিজরাতের পর মদীনায়।

---

[১২৪] *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা,* ইব্ন কাসীর, দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরূত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৭
[১২৫] *আত-তাবাকাত,* মুহাম্মদ ইবনু সা'দ, দারুল ফিকর, বৈরূত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৬০
[১২৬] *সহীহ আল-বুখারী,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৬০; *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৭
[১২৭] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

Dhaka University Institutional Repository

মক্কার কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলে রাসূল (স.) হযরত আবূ বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে নবুওয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরে মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় একটু স্থির হওয়ার পর রাসূল (স.) এবং হযরত আবূ বকর (রা.) পরিবার-পরিজন নিয়ে আসার জন্য হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.), আবূ রাফে (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আরিকাত (রা.)কে মক্কা প্রেরণ করেন। তাঁদেরকে দুইটি উট ও ৫০০ দিরহাম প্রদান করেন। যখন তাঁরা ফিরে এলেন তখন হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন ফাতিমাতুজ জোহরা (রা.), হযরত উম্মু কুলসুম (রা.), হযরত সাওদা বিন্ত যাম্আ (রা.), উম্মু আইমান (রা.) এবং উসামা বিন যায়িদ (রা.)। অন্য দিকে আবদুল্লাহ বিন আরিকাতের সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বকর (রা.), উম্মু রুমান (রা.), হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এবং আসমা বিন্ত আবী বকর (রা.)।

মদীনা পৌঁছে হযরত আয়িশা (রা.) বানু হারেসের মহল্লায় অবস্থিত পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। প্রথম দিকে মদীনার আবহাওয়া মুহাজিরদের সহ্য হলো না। হযরত আবূ বকর (রা.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। হযরত আয়িশা (রা.) অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তার সেবা শুশ্রুষা করলেন। যখন আবূ বকর (রা.) সুস্থ হয়ে উঠলেন তখন হযরত আয়িশা (রা.) নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু দিন কঠিন পীড়া ভোগ করার পর সুস্থ হয়ে উঠেন। এ পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রা.) রাসূল (স.)-এর নিকট আরজ করলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আপনার স্ত্রীকে ঘরে তুলে নিচ্ছেন না কেন?' রাসূল (স.) বললেন– বর্তমানে আমার হাতে মাহর আদায় করার মতো অর্থ নেই। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) নিজের নিকট থেকে ৫০০ দিরহাম রাসূল কারীম (স.)-এর খিদমতে করজে হাসানা হিসেবে পেশ করলেন। এই অর্থ মহানবী (স.) গ্রহণ করলেন এবং হযরত আয়িশা (রা.)-এর নিকট তা প্রেরণ করে প্রথম হিজরীর শাওয়াল মাসে তাঁকে তুলে নিলেন। সে সময় হযরত আয়িশা (রা.)-এর বয়স ছিল ৯ বছর। অন্য বর্ণনায় ১২ বছর বলা হয়েছে।[১২৮]

---

[১২৮] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) মসজিদে নববীর পাশে নির্মিত ছোট একটি ঘরে হযরত আয়িশা (রা.)কে এনে উঠান। আজ যেখানে রাসূল (স.) শুয়ে আছেন সেটাই হযরত আয়িশা (রা.)-এর ঘর।

শৈশব ও কৈশোর বয়স হলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের প্রকৃত সময়। সৌভাগ্যক্রমে এ বয়সের পুরোটা সময় আয়িশা (রা.) রাসূল কারীম (স.)-এর একান্ত সান্নিধ্যে কাটে। যার কারণে তিনি এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভে ধন্য হন যাতে বিশ্বের সকল নারীর জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে যান।

মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতার পুর্ণতা ও পবিত্রতা অর্জন, দ্বীনের আবশ্যকীয় বিষয় ও শরীআতের গূঢ় রহস্য সম্পর্কে জানা এবং আল্লাহ তাআলার কালাম ও আহকামে নববীর জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম। এছাড়াও ইতিহাস, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যায় ছিল তার গভীর জ্ঞান। ইতিহাস ও সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করেন পিতার নিকট থেকে।[১২৯] চিকিৎসা সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রাসূল (স.)-এর নিকট আগত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে। রাসূল (স.) তাঁর জীবনের শেষদিকে অনেক সময় অসুস্থ ছিলেন। আরবের চিকিৎসকরা যেখানে যে ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ দিতেন, হযরত আয়িশা (রা.) তা স্মৃতিতে ধরে রাখতেন।

এমনিভাবে হযরত আয়িশা (রা.) বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করে বিশ্বের নারী সমাজের মাঝে অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হন। বিভিন্ন হাদীসে তারঁ মর্যাদার অনেক বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল কারীম (স.) ইরশাদ করেন, 'পুরুষদের মধ্যে অনেকে পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু নারীদের মধ্যে মারইয়াম বিন্ত

[১২৯] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

ইমরান এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ছাড়া আর কেউ পূর্ণতা অর্জন করেনি। আর গোটা নারীদের উপর আয়িশা (রা.)-এর মর্যাদা তেমন শ্রেষ্ঠ যেমন যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে সারীদের মর্যাদা শ্রেষ্ঠ।'[১৩০]

হযরত আয়িশা (রা.) অনন্য চারিত্রিক গুনাবলী ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর নৈতিকতা ছিল প্রশংসনীয়, হৃদয় ছিল সুপ্রশস্ত। দানশীলতা, মিতব্যয়িতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, স্বল্পেতুষ্টি, ইবাদাত তথা সর্বপ্রকার সৎগুনে তিনি ছিলেন গুনান্বিত।[১৩১]

হযরত আয়িশা (রা.) হাদীস বিষয়ে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তিনি অধিককাল রাসূল কারীম (স.)-এর সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন। তাছাড়া যে মসজিদ ছিল রাসূল (স.)-এর গণশিক্ষা কেন্দ্র, সৌভাগ্যক্রমে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ঘরটি ছিল তারই সাথে।

হযরত আয়িশা (রা.) মুক্সিরীন বা অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী সাত জন সাহাবীর মাঝে ৩য় পর্যায়ে রয়েছেন। তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা ২২১০।[১৩২] তার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে ২৮৬টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ১৭৪ টি মুত্তাফাক আলাইহি, ৫৩টি শুধু বুখারী শরীফে এবং ৬৯টি মুসলিম শরীফে এককভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই হিসেবে বুখারী শরীফে সর্বমোট ২২৮টি এবং মুসলিম শরীফে ২৪৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১৩৩]

এছাড়া হযরত আয়িশা (রা.)-এর অন্য হাদীসগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে সনদসহ সংকলিত হয়েছে। ইমাম আহমাদ (রা.)-এর মুসনাদের ৬ষ্ঠ খন্ডে হযরত আয়িশা (রা.)-এর বর্ণিত

---

[১৩০] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩২

[১৩১] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৪৯

[১৩২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯

[১৩৩] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সকল হাদীস সংকলিত হয়েছে।[১৩৪] বলা হয়ে থাকে, শরীআতের যাবতীয় আহকামের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়িশা (রা.)-এর থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই আল্লামা যাহবী (র.) বলেছেন–

كان فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
يرجعون إليها تفقه بها جماعة

"রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ফকীহ (গভীর জ্ঞানসম্পন্ন) সাহাবীগণ তাঁর (হযরত আয়িশা) কাছ থেকে জানতেন। একদল লোক তাঁর নিকট থেকেই দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।"[১৩৫]

হযরত আয়িশা (রা.) নবী কারীম (স.)-এর পবিত্র বাণী সমূহকে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করেন। তিনি অসংখ্য হাদীস সংরক্ষণ করেই দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং সেগুলো অপরকে শিক্ষাদান, প্রচার ও প্রসারেও তিনি অনন্য ভূমিকা পালন করেন। রাসূল (স.) নির্দেশ দিয়েছেন–

بلـــّغوا عني ولو آية

'আমার থেকে একটি বাণী জানা থাকলেও তা অপরের নিকট পৌঁছে দাও।'[১৩৬]

হযরত আয়িশা (রা.)ও রাসূল (স.)-এর এ নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেন।

রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম ইসলামের দাওয়াত এবং ইল্‌মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মক্কা মু'য়ায্‌যমা, তায়িফ, বাহরাইন, ইয়ামান, কুফা, বসরা প্রভৃতি বড় বড় শহর ও নগরে ভ্রমণ করলেও মদীনাই ছিল মূলত ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাণকেন্দ্র। তখনও মদীনায় হযরত ইব্‌ন ওমার (রা.), হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস ও হযরত যায়িদ ইব্‌ন সাবিত (রা.) প্রমূখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের

---

[১৩৪] *আসহাব রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
[১৩৫] *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহবী, দারুল ফিকর, বৈরূত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭
[১৩৬] *জামি আত-তিরমিজি*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পৃথক পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র চালু ছিল। তবে সবচেয়ে বড় শিক্ষা কেন্দ্রটি ছিল হযরত আয়িশা (রা.)-এর হুজরাকেন্দ্রিক মসজিদ নববী সংলগ্ন সেই বিশেষ স্থান। এখানে তিনি নিয়মিত ইল্‌মে হাদীসের দারস প্রদান করতেন।[১৩৭]

মদীনা ছিল ইসলামী খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র। যিয়ারত ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে চতুর্দিক থেকে মানুষ মদীনায় ছুটে আসতো। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত অসংখ্য মুসলিম নর-নারী একবার না একবার হযরত আয়িশা (রা.)-এর হুজরার দরজায় এসে তাঁকে সালাম পেশ করতো। তিনি সবার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাঁরা শারঈ বিভিন্ন হুকুম-আহকাম জিজ্ঞেস করতেন। তিনি পর্দার অন্তরাল থেকে এসব সমস্যার সমাধান করে দিতেন।

হযরত আয়িশা (রা.)-এর শিক্ষাকেন্দ্রে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষের চেয়ে নারীদের ভীড় হতো বেশি। নারী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে এবং যে পুরুষদের থেকে তাঁর পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁরা সবাই হুজরার ভিতরের মসজিদে বসতেন, আর বাকীরা বসতেন হুজরার বাইরে মসজিদে নববীর মধ্যে। দরজায় পর্দা টানানো থাকতো। পর্দার আড়ালে তিনি বসতেন।[১৩৮]

এছাড়া তিনি বিভিন্ন গোত্রের বালক-বালিকা এবং ইয়াতিমদেরকে নিজ তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান করতেন। দুগ্ধপান করার সাথে সম্পর্কিত অনেক বয়স্ক ছেলেদেরকে নিজের ঘরে প্রবেশ করে হাদীস শিক্ষার অনুমতি দিতেন।

হাজ্জের সময়ও হযরত আয়িশা (রা.)-এর কাছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জ্ঞান পিপাসু মুসলিমদের ভীড় জমতো। হিরা ও সাবীর পর্বতদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর তাঁবু

---

[১৩৭] *সীরাতে আয়িশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯

[১৩৮] *সীরাতে আয়িশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

স্থাপন করা হতো, দূর-দূরান্তের জ্ঞান-পিপাসুগণ সেই তাঁবুর পাশে সমবেত হতেন এবং তিনি তাঁদেরকে হাদীস ও শারঈ বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। তিনি মুসলমানদের বিভিন্ন সংশয় নিরসন করতেন।[১৩৯]

হযরত আয়িশা (রা.)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্য হতে অনেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর প্রায় দু'শো সাগরিদ বা শিষ্য ছিলেন। এসব শিষ্যের মধ্যে কাসিম বিন্ মুহাম্মদ (রা.), মাসরুক তাবেয়ী (রা.), আয়িশা বিন্ত তালহা (রা.), আবূ সালামা (রা.) এবং উরওয়াহ বিন যোবায়ের (রা.)-এর নাম প্রসিদ্ধ।[১৪০]

তাফসীর শাস্ত্রেও হযরত আয়িশা (রা.)-এর অবদান ছিল অনেক বেশি। যদিও নুযূলে কুরআনের চর্তুদশ বছরে মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি রাসূল (স.)-এর ঘরে আসেন এবং নুযূলে কুরআনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত হয় তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বয়োপ্রাপ্তির পূর্বে। কিন্তু অসাধারণ মেধা ও মননের অধিকারী হওয়ার কারণে তিনি শৈশব কালকেও বৃথা যেতে দেননি। এ সময়েই তিনি রাসূল (স.)-এর পবিত্র সাহচর্যে থেকে কুরআন নাযিল, প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। তাছাড়া তাঁর গৃহেই অধিকাংশ সময় রাসূল (স.)-এর নিকট কুরআন মাজীদের আয়াত নাযিল হতো। তিনি রাসূল (স.) থেকে কুরআন মাজীদ শিক্ষা লাভ করতেন।

হযরত আয়িশা (রা.)-এর অভ্যাস ছিল যদি কুরআনের কোনো আয়াতের অর্থ বুঝে না আসতো, তিনি রাসূল (স.)কে তা প্রশ্ন করে জেনে নিতেন।

আবূ ইউসুফ নামে হযরত আয়িশা (রা.)-এর একজন লেখা পড়া জানা দাস ছিল। তিনি এই আবূ ইউসুফকে দিয়ে নিজের জন্য কুরআন লিখিয়েছিলেন।[১৪১]

---

[১৩৯] *সীরাতে আয়িশা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

[১৪০] মহিলা সাহাবী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০

[১৪১] *মুসনাদে ইমাম আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

এসকল পরিবেশ ও অবস্থার কারণে হযরত আয়িশা (রা.) কুরআনের প্রতিটি আয়াতের পাঠ-পদ্ধতি, ভাব ও তাৎপর্য এবং হুকুম-আহকাম বের করার পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন। সহীহ সনদে সাহাবায়ে কিরাম থেকে কুরআন মাজীদের তাফসীর খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে হযরত আয়িশা (রা.)-এর তাফসীর সম্পর্কিত বর্ণনা একেবারে কম নয়।[১৪২]

ইলমে ফিক্হ ও কিয়াসেও হযরত আয়িশা (রা.)-এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খুলাফায়ে রাশিদাহর যুগের শেষের দিকে বিভিন্ন কারণে সাহাবায়ে কিরামের অনেকেই মক্কা, তায়িফ, দামেস্ক, বসরা প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। এর ফলে জ্ঞান চর্চার পরিধি আরো বিস্তার লাভ করে। এসময়ে ইব্ন আব্বাস, ইব্ন ওমার, আবু হুরাইরা ও আয়িশা (রা.)-এ চারজন মদীনায় ফিকহ্ ও ফাত্ওয়ার কাজ করতেন। কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বিধান যেখানে নেই সেখানে এ চারজনের নীতিও ছিল ভিন্ন। এক্ষেত্রে হযরত ইব্ন ওমার (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-এর রীতি ছিল উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোনো বিধান অথবা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোনো আমল থাকলে তাঁরা তা বলে দিতেন। অন্যথায় নীরব থাকতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলে সমাধানকৃত মাসআলার উপর কিয়াস করে নিজের বোধ ও জ্ঞান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেন। এক্ষেত্রে হযরত আয়িশা (রা.)-এর মূলনীতি ছিল, প্রথমে তিনি কুরআন মাজীদে সমস্যার সমাধান খুঁজতেন। সেখানে না পেলে সুন্নাহর দিকে দৃষ্টি দিতেন। সুন্নাহতেও না পেলে স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী কিয়াস করতেন।

হযরত আয়িশা (রা.) ছিলেন একজন সুভাষিণী। তাঁর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।

---

[১৪২] *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া তিনি আরবি ভাষার উপর অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তাঁর ছাত্র মূসা ইব্ন তালহা এ সম্পর্কে যথার্থ বলেন–

ما رأيت أفصح من عائشة رضي الله عنها

"আমি আয়িশা (রা.) অপেক্ষা অধিকতর প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধভাষী আর কাউকে দেখিনি।"[১৪৩]

হযরত আয়িশা (রা.) প্রাচীন আরবের অনেক লোক কাহিনীও জানতেন এবং সুন্দরভাবে তা বর্ণনাও করতে পারতেন। আরবের এগার সহোদরার একটি লম্বা কিস্সা তিনি একদিন স্বীয় স্বামী রাসূল (স.)কে শুনিয়েছিলেন। রাসূল (স.) একাগ্রচিত্তে তাঁর বর্ণিত কিস্সা শুনেন।[১৪৪]

এসব কিস্সা বর্ণনাতে তাঁর চমৎকার বাচনভঙ্গি, ভাষার লালিত্য, আরবী সাহিত্যে অগাধ নৈপূণ্য লক্ষ্য করা যায়।

হযরত আয়িশা (রা.) কবিতার আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, চিত্রকল্প ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ জ্ঞান রাখতেন। কেননা তিনি আরবের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এমন একটি পর্বে জন্মগ্রহণ করেন, যখন আরবের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। হযরত আয়িশা (রা.)-এর পরিবারেও কাব্যচর্চা হতো। পিতা আবূ বকর (রা.)ও একজন কবি ছিলেন। মূলত পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্যশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন।

ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগের কবিদের অনেক কবিতা আয়িশা (রা.)-এর মুখস্থ ছিল। সেসব কবিতা বা তার কিছু অংশ সময় সুযোগমত উদ্ধৃতির আকারে উপস্থাপন

---

[১৪৩] *জামি আত্-তিরমিজি*, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৭

[১৪৪] *সীরাতে আয়িশা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। তাছাড়া হযরত আয়িশা (রা.) নিজেও একজন কবি ছিলেন। পিতার ইন্তিকালের পর তিনি যে শোক গাঁথাটি রচনা করেন, তার কিছু অংশ আল্লামা আলুসী তাঁর 'বুলুগুল আরীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন।

হযরত আয়িশা (রা.) একজন শ্রেষ্ঠ খতীব বা বক্তা ছিলেন। বাগ্মিতা ও বিশুদ্ধভাষিতা যে একজন সুবক্তার অন্যতম গুন, তেমনি স্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চকণ্ঠ এবং ভাব-গাম্ভীর্যের অধিকারী হওয়াও তার জন্য জরুরি। হযরত আয়িশা (রা.)-এর কণ্ঠধ্বনি এমনই ছিল। আহনাফ ইব্ন কায়স একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী। সম্ভবত তিনি বসরায় হযরত আয়িশা (রা.)-এর একটি ভাষণ শোনার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছেন– আমি হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওমার (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং এ সময় পর্যন্ত সকল খলিফার ভাষণ শুনেছি; কিন্তু হযরত আয়িশা (রা.)-এর মুখ থেকে বের হওয়া কথায় যে সৌন্দর্য ও জোর থাকতো তা আর কারও কথায় পাওয়া যেতনা।"[১৪৫]

হযরত আয়িশা (রা.) বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিম মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করেন। ইমাম বুখারী (র.) বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা.) উহুদ যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে বলেন– "আমি হযরত আয়িশা (রা.) ও হযরত উম্মু সুলাইম (রা.)কে দেখলাম, তাঁরা কাঁধে করে মশক ভরে পানি এনে আহতদের মুখে ঢালছেন। পানি শেষ হয়ে গেলে আবার ভরে এনে ঢালছেন।" [১৪৬]

---

[১৪৫] *সীরাতে আয়িশা*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০

[১৪৬] *সহীহ আল-বুখারী*, গাযওয়াতু উহুদ

Dhaka University Institutional Repository

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) ৫৮ হিজরীর ১৭ রমযান মঙ্গলবার মুতাবিক ১৩ জুন ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৬৬ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[১৪৭] সে সময় ছিল আমীর মু'য়াবিয়ার শাসনামল। মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন অসংখ্য মানুষ সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর দরজায় ভীড় জমাতো। কেউ কুশল জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ভাল আছি।[১৪৮]

পরিশেষে বলা যায়, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) একটি অনন্য নাম, একটি ইতিহাস। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকার কারণে মুসলিম উম্মাহ্ তাঁকে চিরকাল শ্রদ্ধাভরে স্মরণে রাখবে। নারী বিষয়ক অনেক শারঈ মাসআলা মাসায়েল মুসলিম সমাজ হযরত আয়িশা (রা.)-এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে।

---

[১৪৭] *ইস্‌তিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* আবূ ওমার ইউসুফ ইব্‌ন আবদিল বার, দারুন নাহ্‌দাতিল মিসরিয়া, কায়রো, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮৮৫

[১৪৮] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্যান্য নবী পত্নীগণের ভূমিকা

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত আয়িশা (রা.) ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যে অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা ইতোপূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে অন্যান্য নবী পত্নীগণের ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো।

হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.)

নাম সাওদা। তাঁর পিতার নাম যাম'আ ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন আবদি শাম্‌স ইব্‌ন আবদি ওয়াদ্দ ইব্‌ন নসর ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন হাসল ইব্‌ন আমির।[১৪৯] মাতার নাম শামূস বিন্‌ত কায়িস ইব্‌ন আমর ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন লাবীদ।[১৫০] পিতা যাম'আ ইব্‌ন কায়িস কুরাইশ বংশীয় এবং মাতা শামূস বিন্‌ত কায়িস মদীনার বিখ্যাত নাজ্জার গোত্রীয়।[১৫১] রাসূল (স.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মা সালমাও ছিলেন এই নাজ্জার খান্দানের মেয়ে। সাওদার নানা কায়িস ইব্‌ন আমর এবং সালমা বিন্‌ত আমর ছিলেন ভাই-বোন। হযরত সাওদার ডাকনাম ছিল 'উম্মুল আসওয়াদ'।[১৫২]

ইসলামপূর্ব যুগে হযরত সাওদা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল স্বীয় চাচাতো ভাই হযরত সাকরান ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সঙ্গে।[১৫৩]

---

[১৪৯] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫২

[১৫০] প্রাগুক্ত

[১৫১] *তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত*, মুহিউদ্দিন ইব্‌ন শারফ আন-নবুবী, আত-তিবায়া আল-মুগীরিয়া, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪৮

[১৫২] প্রাগুক্ত

[১৫৩] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫২

Dhaka University Institutional Repository

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.)কে অত্যন্ত পূত-পবিত্র স্বভাব দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স.) যখন হকের দাওয়াত প্রদান শুরু করলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে তাতে সাড়া দিলেন। তাঁর স্বামীও তাঁর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত সাওদা (রা.) এবং হযরত সাকরান (রা.)ও অন্যান্য মুসলমানদের সহগামী হয়ে হাবশায় হিজরাত করেন। কয়েক বছর সেখানে অবস্থানের পর মক্কা ফিরে আসেন। কিছুদিন পর হযরত সাকরান (রা.) ইন্তিকাল করেন এবং হযরত সাওদা (রা.) বিধবা হয়ে যান।[১৫৪]

নবী কারীম (স.) হিজরাতের প্রায় ৩ বছর পূর্বে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা.)কে বিয়ে করেন।[১৫৫]

হযরত খাদীজা (রা.) একাকীত্বের অস্থিরতায়, বিপদ-আপদের ভয়াবহতায় এবং অত্যাচারী-উৎপীড়কের নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় রাসূল (স.)-এর একান্ত সঙ্গীনী ছিলেন। তিনি সংকটময় মুহূর্তে রাসূল (স.)কে সান্ত্বনা দিতেন, সমবেদনা প্রকাশ এবং পাশে থেকে সকল বাধা অতিক্রমে সাহায্য করতেন। এসব কারণে খাদীজা (রা.)-এর ইন্তিকালে রাসূল (স.) খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় হযরত খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা.) একদিন রাসূল কারীম (স.)-এর কাছে গেলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আবার বিয়ে করুন। রাসূল কারীম (স.) প্রশ্ন করেন– পাত্রী কে? খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা.) বললেন: বিধবা এবং কুমারী-দুই রকম পাত্রীই আছে। এখন আপনি যাকে পছন্দ করেন তার ব্যাপারে কথা বলা যেতে পারে। রাসূল (স.) পুনরায় জানতে চাইলেন-পাত্রী কে? খাওলা বললেন-বিধবা পাত্রী সাওদা বিন্‌ত যাম'আ, আর কুমারী পাত্রী হযরত আবু বকর (রা.)-এর মেয়ে আয়িশা।[১৫৬] রাসূল (স.) বললেন– এ ব্যাপারে ভূমিকা পালনের জন্য মেয়েরা অধিকতর যোগ্য। এভাবে তিনি সম্মতি দান করেন।

---

[১৫৪] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[১৫৫] *শাজারাতুজ জাহাবী,* ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী, আল-মাকতাব আত-তিজারী, বৈরূত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪

[১৫৬] *সীরাত আয়িশা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর সম্মতি পেয়ে খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা.) গেলেন সাওদার গৃহে। তিনি সাওদার বৃদ্ধ পিতার নিকট বিয়ের পয়গাম পেশ করেন। সাওদা (রা.)-এর পিতা রাজি হলে রাসূল (স.) বরবেশে উপস্থিত হন এবং সাওদার পিতা সাওদাকে তাঁর হাতে তুলে দেন।[১৫৭]

যারকানী (র.) বর্ণনা করেছেন, প্রথম স্বামী হযরত সাকরান (রা.)-এর জীবদ্দশায় একবার হযরত সাওদা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন। এমন সময় আসমান ফেটে গেল এবং চাঁদ তাঁর উপর এসে পড়লো। তিনি এই স্বপ্নের কথা হযরত সাকরান (রা.)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। হযরত সাকরান (রা.) বললেন, 'এই স্বপ্নের তাবীর তো এই মনে হয় যে, শিগগিরই আমি মারা যাবো এবং আরবের চাঁদ মুহাম্মদ (স.) তোমাকে বিয়ে করবেন।' বাস্তবিকই এই স্বপ্নের তাবীর কিছুদিন পরই পূর্ণ হলো।[১৫৮]

কতিপয় বর্ণনা অনুযায়ী, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর রাসূল কারীম (স.) হযরত সাওদা (রা.) কে বিয়ে করেন। কিন্তু অন্যদের মতে, হযরত আয়িশা (রা.)-এর সঙ্গে রাসূল (স.)-এর দ্বিতীয় বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[১৫৯]

নবুওয়্যাতের এয়োদশ বছরে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) হিজরাত করে মদীনায় তাশরীফ নেন। মদীনায় পৌঁছে একটু স্থির হওয়ার পর হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.) এবং হযরত আবূ রাফে (রা.)কে আবার মক্কায় পাঠান হযরত সাওদাসহ অন্যদের মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। হযরত যায়িদ ইবন্‌ হারিসা (রা.) ও হযরত আবূ রাফে ফাতিমা, উম্মু কুলসুম, সাওদা, উম্মু আইমান ও উসামা (রা.)কে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।[১৬০]

---

[১৫৭] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[১৫৮] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[১৫৯] প্রাগুক্ত

[১৬০] *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে সাওদা (রা.)-এর চেয়ে দীর্ঘদেহী আর কেউ ছিলেন না। হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন, যে একবার তাঁকে কেউ দেখেছে তার চোখ থেকে তিনি গোপন হতে পারতেন না।[১৬১] আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেছেন, তিনি ছিলেন স্থূলকায়।[১৬২]

হিজরাতের প্রায় ৩ বছর পূর্বে হযরত সাওদা (রা.) রাসূল (স.)-এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। নবুওয়্যাতের দশম বছরের রমযান মাস থেকে রাসূল (স.)-এর ওফাত পর্যন্ত প্রায় ১৩ বছর স্ত্রী হিসেবে রাসূল কারীম (স.)-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। কিছুদিন আগে-পরে রাসূল (স.)-এর সঙ্গে হযরত সাওদা ও হযরত আয়িশা (রা.)-এর বিয়ে হয়। বিয়ের পর হযরত আয়িশা (রা.) প্রায় ৩ বছর পিতার গৃহে অবস্থান করেন। এ সময় একমাত্র হযরত সাওদা (রা.) রাসূল (স.)-এর গৃহে স্ত্রী হিসেবে ছিলেন। এ সময় তিনি অতি সুষ্ঠুভাবে রাসূল (স.)-এর পরিবারে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন। মাতৃহারা কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.)সহ অন্য কন্যাদের লালন-পালনের দায়িত্বও তিনি পালন করেন। মোটকথা, রাসূল (স.)-এর জীবনে এক কঠিন ও সংকটময় পর্বে হযরত সাওদা (রা.) সহধর্মিণী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে হযরত খাদীজা (রা.)-এর শূণ্যতা পূরণের চেষ্টা করেন।[১৬৩]

নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতাও হযরত সাওদা (রা.)-এর চরিত্রের এক বিশেষ দিক। তিনি এবং হযরত আয়িশা (রা.) কিছু আগে-পরে রাসূল (স.)-এর গৃহে স্ত্রী হিসেবে আগমন করেন। তবে হযরত আয়িশা (রা.) অপেক্ষা তাঁর বয়স ছিল বেশি। তাই তিনি স্বামী রাসূল (স.)-এর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের ভাগের রাতটি হযরত আয়িশা

---

[১৬১] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৭০৭

[১৬২] *সীরাতুন নবী*, আল্লামা শিবলী নু'মানী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪০৫

[১৬৩] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

Dhaka University Institutional Repository

(রা.)কে দান করে দেন।[১৬৪] এ সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.) হযরত উরওয়া (রা.)কে বলেন– 'ভাতিজা! রাসূল (স.) স্ত্রীদের জন্য তাঁর বন্টিত রাতে অবস্থানের ব্যাপারে কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না। অনেক দিন এমন গেছে তিনি আমাদের সকলের নিকট এসে ঘুরে গেছেন। কোনো স্ত্রীকেই স্পর্শ করেননি। শেষে সেই স্ত্রীর নিকট রাত কাটিয়েছেন যার জন্য রাতটি নির্ধারিত ছিল। হযরত সাওদা (রা.)-এর যখন বার্ধক্য এসে যায় এবং এই ভয় পেয়ে যায় যে, না জানি রাসূল (স.) তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। তখন তিনি বলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার ভাগের রাতটি আমি হযরত আয়িশা (রা.)কে দিলাম। রাসূল (স.) তাঁর এ আবেদন গ্রহণ করেন।'[১৬৫]

পর্দার বিধান নাযিলের পূর্বে হযরত সাওদা (রা.) সহ মেয়েরাও প্রাকৃতিক কাজ সমাধার জন্য রাতের বেলায় বাড়ির বাইরে খোলা ময়দানে চলে যেতেন। যেহেতু সে সময় মক্কার কোন গৃহের অভ্যন্তরে পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। পায়খানা থাকাটা তারা শোভন মনে করতো না। হযরত ওমার ফারুক (রা.)-এর মত ছিল যে, নবী কারীম (স.)-এর স্ত্রীদের বাইরে বেরুনো উচিত নয়। প্রসঙ্গটি তিনি একবার রাসূল (স.)-এর নিকট উত্থাপনও করেছিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসেনি তাই রাসূল (স.) চুপ ছিলেন। হযরত সাওদা (রা.) ছিলেন দীর্ঘাকৃতির। বহু মানুষের মধ্যে তাকে চেনা যেত। একদিন রাতে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় হযরত ওমার (রা.)-এর দৃষ্টিতে পড়েন। হযরত ওমার (রা.) তাঁকে চিনে ফেলেন এবং বললেন, 'আমি আপনাকে চিনে ফেলেছি।' হযরত ওমার (রা.)-এর এই বাক্য হযরত সাওদা (রা.)-এর নিকট অত্যন্ত অসহনীয় মনে হলো এবং রাসূল (স.)-এর নিকট হযরত ওমার (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং সকল মহিলা পর্দার অনুসরণ করতে থাকেন।[১৬৬]

---

[১৬৪] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড পৃ. ৩০৮

[১৬৫] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৬১

[১৬৬] *সহীহ আল-বুখারী*, বাবুল হাদায়া

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাওদা (রা.) অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। যা কিছু তাঁর নিকট আসতো তা তিনি অত্যন্ত উদার হস্তে অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। একবার খলীফা হযরত ওমার ফারুক (রা.) তাঁর খিদমতে দিরহামের একটি থলে প্রেরণ করেছিলেন। থলেটি ছিল উপঢৌকন স্বরূপ। তিনি বহনকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি আছে? সে বললো– দিরহাম। তিনি বললেন, থলেটি দেখতে তো খেজুরের থলের মতো। একথা বলে তিনি খেজুর বণ্টনের মতো সকল দিরহাম অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন। [১৬৭]

হযরত সাওদা (রা.) অত্যন্ত পবিত্র চরিত্রের মানুষ ছিলেন। একবার হযরত আয়িশা (রা.) বলেছিলেন– 'সাওদা ছাড়া অপর কোনো মহিলাকে দেখে আমার এমন ইচ্ছা হয়নি যে, তাঁর দেহে যদি আমার প্রাণটি হতো।'[১৬৮]

রাসূল (স.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে সকল আযওয়াজে মুতাহ্হারাত (পবিত্র স্ত্রীগণ) অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন হযরত সাওদা (রা.)। বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ (স.) সকল স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আমার পরে তোমরা ঘরে অবস্থান করবে।'[১৬৯] হযরত সাওদা (রা.) এই নির্দেশের উপর এত কঠোরভাবে আমল করেন যে, হাজ্জের উদ্দেশ্যেও কখনো গৃহ হতে বের হননি। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর তাঁর অন্য স্ত্রীগণ হাজ্জ আদায় প্রশ্নে এই নির্দেশ ছিল না বলে মনে করতেন। কিন্তু হযরত সাওদা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর সারা জীবন ঘর থেকে বের হননি। [১৭০] হযরত সাওদা (রা.) বলতেন– 'আমি হাজ্জ ও ওমরাহ দুটোই আদায় করেছি। এখন নির্দেশ অনুযায়ী ঘর থেকে বাইরে বেরুবো না।'[১৭১]

---

[১৬৭] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৬

[১৬৮] *তাহযীবুত তাহযীব,* ইব্ন হাজার আসকালানী, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, হায়দরাবাদ, ১৩২৫ হি, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৫৫

[১৬৯] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৮

[১৭০] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৫

[১৭১] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬৫

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে হযরত সাওদা (রা.) অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি রাসূল (স.) হতে পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৭২] তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, হযরত ইবনুল যুবাইর এবং হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন আবদিল্লাহ আল-আনসারী (রা.) প্রমূখ।[১৭৩]

হযরত সাওদা (রা.)-এর ইন্তিকালের সময়কাল নিয়ে সীরাত বিশেষজ্ঞগণের মাঝে মতপার্থক্য দেখা যায়। আল-ওয়াকিদীর মতে, ৫৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে[১৭৪] এবং ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলীর মতে, ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। [১৭৫]

ইব্ন হাজার আসকালানী ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা সূত্রে বলেন, হযরত ওমার (রা.)-এর খিলাফাতকালের শেষ দিকে তাঁর ইন্তিকাল হয়। ঐতিহাসিক বালাজুরী বলেন, ২৩ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। খলীফা হযরত ওমার (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান।[১৭৬]

---

[১৭২] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯০
[১৭৩] *তাহযীবুত তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৫৫
[১৭৪] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৭
[১৭৫] *শাযারাতুয যাহাব,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪
[১৭৬] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাকরান (রা.)-এর ঔরসে তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। তাঁর নাম ছিল আবদুর রহমান (রা.)। তিনি হযরত ওমার (রা.)-এর খিলাফাত কালে জালুলার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। রাসূল (স.)-এর ঔরসে হযরত সাওদা (রা.)-এর গর্ভে কোনো সন্তান হয়নি।[১৭৭]

[১৭৭] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত হাফসা বিন্‌ত ওমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)

নাম হাফসা, তিনি দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমার ফারুক (রা.)-এর কন্যা। তাঁর বংশনামা হলো– হাফসা বিন্‌ত ওমার ইব্‌ন আল-খাত্তাব ইব্‌ন নূফায়ল ইব্‌ন আবদিল উয্‌যা ইব্‌ন রাবাহ ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন কুরত ইব্‌ন রাযযা ইব্‌ন আদী ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন লুওয়াই।[১৭৮] তাঁর মাতৃ পরিচয় হলো– যায়নাব বিন্‌ত মায্‌উন ইবন হাবীব ইবন ওয়াহাব। যিনি ছিলেন মশহুর সাহাবী উসমান ইবন মাযউনের বোন। যায়নাব বিন্‌ত মাযউন অত্যন্ত সম্মানীয়া সাহাবী ছিলেন।[১৭৯]

ইসলামের অন্যতম ফকীহ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওমার (রা.) ছিলেন হযরত হাফসা (রা.)-এর সহোদর।[১৮০]

হযরত হাফসা (রা.) নবী কারীম (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ওমার (রা.) বলেন– মক্কার কুরাইশরা তখন কা'বা ঘরের পুন:নির্মাণের কাজে ব্যস্ত ছিল।[১৮১]

হযরত খুনাইস ইবন হুযাফা ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন আদী (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। হযরত খুনাইস দাওয়াতে হকের প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং হযরত হাফসা (রা.)ও স্বামীর সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়্যাতের ৬ বছর পর হযরত খুনাইস (রা.) হিজরাত করে হাফসায় গমন করেন। রাসূল (স.)-এর

---

[১৭৮] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮১

[১৭৯] প্রাগুক্ত

[১৮০] *উসুদুল গাবা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪২৫

[১৮১] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে মক্কা ফিরে আসেন এবং পুনরায় হযরত হাফসা (রা.)-এর সঙ্গে হিজরাত করে মদীনা গমন করেন।[১৮২]

হযরত হাফসা (রা.) স্বামীর সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করে অল্পকাল পরেই বিধবা হন। তাঁর স্বামী ২য় হিজরীতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আঘাত প্রাপ্ত হন এবং বাড়ি ফিরে এসে ঐ আঘাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[১৮৩] অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে, তাঁর স্বামী বদর ও উহুদ যুদ্ধে যোগদান করেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান এবং মদীনায় ফিরে এসে ইন্তিকাল করেন।[১৮৪] তখন হযরত হাফসা (রা.)-এর বয়স ২০ বছরও হয়নি।[১৮৫]

হযরত হাফসা (রা.)-এর ইদ্দাত পুরো হলে হযরত ওমার (রা.) তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের ব্যাপারে চিন্তা করলেন। ঘটনাক্রমে সে সময় রাসূল (স.)-এর কন্যা ও হযরত উসমান (রা.)-এর স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা (রা.) ইন্তিকাল করেন। হযরত ওমার (রা.) তখন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁর সাথে স্বীয় কন্যার বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উসমান (রা.) বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে সময় নেন। কয়েকদিন পর পুনরায় দেখা হলে তিনি বলেন– 'আমি এ সময় বিয়ে করতে চাচ্ছি না।' তখন হযরত ওমার (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)কে হযরত হাফসা (রা.)কে বিয়ে করার জন্য বললেন। কিন্তু তিনি চুপ রইলেন। এতে হযরত ওমার (রা.) মনোক্ষুণ্ন হলেন এবং তিনি রাসূল (স.)-এর খিদমাতে হাজির হয়ে সকল ঘটনা বর্ণনা করলেন। হযরত ওমার (রা.)-এর দুঃখের কথা শুনে রাসূল (স.) বলেন– 'আমি কি তোমাকে উসমানের চেয়ে ভালো জামাই এবং উসমানকে তোমার চেয়ে ভালো শ্বশুরের সন্ধান দেব না?' ওমার (রা.) বলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই দেবেন। তখন রাসূল (স.) বলেন– 'তোমার মেয়ে হাফসাকে আমার

---

[১৮২] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[১৮৩] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৪, ৪২২

[১৮৪] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৭

[১৮৫] *আত-তারীখ আল-ইসলামী,* ড. আহমদ শালবী, কায়রো, ১৯৮২, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩১

Dhaka University Institutional Repository

সাথে বিয়ে দিয়ে দাও, আর আমার মেয়ে উম্মু কুলসুমকে বিয়ে দেই উসমানের সাথে।[১৮৬] এরপর রাসূল (স.) হযরত হাফসা (রা.)কে বিয়ে করেন। রাসূল (স.) চার'শ দিরহাম মাহর হিসাবে প্রদান করেন।

ব্যক্তি জীবনে হযরত হাফসা (রা.) অত্যন্ত ইবাদাত গুজার ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর সম্পর্কে নবী কারীম (স.)কে বলেছেন– 'তিনি অতিমাত্রায় রোযা পালনকারিণী এবং রাতে বেশি ইবাদাতকারিণী।'[১৮৭]

পিতা হযরত ওমার (রা.)-এর মতো হযরত হাফসা (রা.)-এর মেজাজও ছিল তীক্ষ্ণ। কখনো কখনো রাসূল (স.)-এর কথার পিঠে কথা বলতেন। তাতে দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য দেখা দেয়ার উপক্রম হতো। হযরত ওমার (রা.) মেয়েকে এব্যাপারে সংশোধন করতেন। তাঁকে লক্ষ্য করে ওমার (রা.) বলতেন– 'তুমি রাসূল (স.)-এর কথার উত্তর করবে না।'[১৮৮]

হযরত আয়িশা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.) পরস্পর সতীন হলেও তাঁদের সম্পর্ক ছিল বোনের ন্যায়। অধিকাংশ সময়ই তাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতেন। আয়িশা (রা.) হযরত হাফসা (রা.) সম্পর্কে বলেন– হাফসা বাপের বেটি, তাঁর বাপ যেমন প্রতিটি কথা ও কাজে দৃঢ় সংকল্প, হাফসাও তেমন।[১৮৯] রাসূল (স.)-এর স্ত্রীগণের মাঝে একমাত্র হযরত হাফসা (রা.)-ই আমার সমকক্ষতার দাবিদার ছিলেন।[১৯০]

হযরত হাফসা (রা.)-এর মাঝে প্রবল দাজ্জাল ভীতি ছিল। মদীনায় ইব্ন সাইয়্যিদ

---

[১৮৬] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৩

[১৮৭] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৫

[১৮৮] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৭

[১৮৯] *সুনানে আবু দাউদ,* হাফসার আলোচনা অধ্যায়

[১৯০] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৭

Dhaka University Institutional Repository

নামে এক ব্যক্তি ছিল। রাসূল কারীম (স.) দাজ্জালের যতগুলো আলামত বর্ণনা করেছিলেন, এই লোকটির মধ্যে তাঁর অনেকগুলি বিদ্যমান ছিল। এমনকি তার সম্পর্কে রাসূল (স.)-এরও সন্দেহ ছিল। একদিন হযরত হাফসা (রা.) ও আবদুল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.)-এর সাথে পথে সেই লোকটির দেখা হয়ে গেল। হযরত ইব্ন ওমার (রা.) তাকে কিছু বলতেই সে রেগে এতো ফুলে উঠে যে, পথই বন্ধ হয়ে যায়। তখন ইব্ন ওমার (রা.) তাকে মারতে উদ্যত হলে এমতাবস্থায় হযরত হাফসা (রা.) ভীত হয়ে পড়েন। তিনি ইব্ন ওমার (রা.) কে বলেন, তার সাথে তোমার সম্পর্ক কী? তুমি কি জান না রাসূল (স.) বলেছেন– দাজ্জালের ক্রোধই তার বের হবার কারণ হবে।[১৯১]

হযরত হাফসা (রা.)-এর তৎকালীন আরবের অন্য সকল নারী-পুরুষের মতোই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ হয়নি, কিন্তু পিতা হযরত ওমার (রা.) ও স্বামী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁর মধ্যে জ্ঞানার্জন ও দ্বীনকে বুঝার প্রবল আগ্রহ জন্ম নেয়। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। দ্বীনি বিষয়ে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল, বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে তা সহজেই অনুমান করা যায়।[১৯২]

রাসূল কারীম (স.) একবার বললেন– আমি আশা করি বদর ও হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ জাহান্নামে যাবে না, তখন এতে আপত্তি জানিয়ে হযরত হাফসা (রা.) বলে উঠলেন, আল্লাহ তো বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে সেখানে (জাহান্নামে) হাযির হবে না।"[১৯৩]

একথা শুনে রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক, তবে একথাও তো আল্লাহ

---

[১৯১] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২২৩

[১৯২] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২১৩

[১৯৩] আল-কুরআন, সূরা মারইয়ামঃ ৭১

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন–

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا

"অত:পর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের উদ্ধার করবো এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।"[১৯৪]

হযরত হাফসা (রা.)-এর এ ধরনের বাক্যালাপে সন্তুষ্ট হয়ে এবং তাঁর মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে নবী কারীম (স.)ও সবসময় তাঁকে জ্ঞানীরূপে গড়ে তুলতে চিন্তা করতেন। হযরত শিফা বিন্ত আবদিল্লাহ (রা.) নামে একজন নারী সাহাবী ছিলেন। তিনি লেখা-পড়া জানতেন। হযরত হাফসা (রা.) তাঁর নিকট থেকে লেখা শিখেন।

স্ত্রী হিসাবে রাসূল কারীম (স.)কে কাছ থেকে দেখার, তাঁর থেকে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য হযরত হাফসা (রা.)-এর হয়েছে। যার কারণে তিনি হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো তিনি স্বয়ং রাসূল (স.) এবং পিতা হযরত ওমার (রা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেন।[১৯৫] তাঁর বর্ণিত হাদীস গুলোর মধ্যে ৪টি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ও মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে এবং ৬টি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৯৬]

হযরত হাফসা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন– হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.), হযরত হামযা ইব্ন আবদিল্লাহ (রা.), হযরত সাফিয়্যা বিন্ত আবী ওবায়দা (রা.), হযরত মুত্তালিব ইব্ন আবী ওয়াদায়া (রা.), উম্মু

---

[১৯৪] আল-কুরআন, সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২

[১৯৫] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৩৯

[১৯৬] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩০

Dhaka University Institutional Repository

মুবাশ্‌শির আল আনসারিয়্যা, আবদুর রহমান ইব্‌ন হারেস ইব্‌ন হিশাম, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়্যা, শুতাইর ইব্‌ন শাকাল, সাওয়া আল-খুযাঈ, আল-মুসায়্যিব ইব্‌ন রাফে প্রমূখ।[১৯৭]

রাসূল (স.)-এর ইন্‌তিকালের পর হযরত হাফসা (রা.) জনগণের পক্ষে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে খলীফাদের সাথে, বিশেষ করে পিতা হযরত ওমার (রা.)-এর সাথে কথা বলতেন। অনেক সময় খলীফাও স্বীয় মেয়ের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। একদা হযরত ওমার (রা.) রাতে পরিভ্রমণে বের হয়ে এক মহিলাকে করুণ সুরে একটি বিরহ সঙ্গীত গাইতে শুনলেন। তারপর খলীফা মেয়ে হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন– মেয়েরা সর্বাধিক কতদিন স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? হযরত হাফসা (রা.) বলেন– ছয় বা চার মাস। তখন খলীফা বলেন– আমি এর চেয়ে বেশিদিন কোনো সৈনিককে আটকে রাখবো না।[১৯৮]

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) কুরআনের যে কপি তৈরি করান, তাঁর ওফাতের পর তা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমার (রা.)-এর কাছে ছিল। তারপর তা হযরত হাফসা (রা.)-এর কাছে রাখা হয়। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত কপিটি তাঁর কাছেই রক্ষিত ছিল।[১৯৯]

হযরত হাফসা (রা.)-এর ওফাতের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। তবে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মতে, তিনি ৪৫ হিজরীতে মদীনায় ওফাত পান। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর শাসনামল এবং তখন মদীনার গভর্ণর ছিলেন মারওয়ান। তিনি জানাযার নামায পড়ান এবং লাশের সাথে জান্নাতুল বাকী গোরস্তান পর্যন্ত যান। দাফন

---

[১৯৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

[১৯৮] *হায়াতুস সাহাবা,* ইউসুফ আল-কানদালুবী, দারুল কালাম, দামেস্ক, ২য় সং, ১৯৮৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৬

[১৯৯] *কানযুল উম্মাল,* আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী, মুওয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ৫ম সং, ১৯৮৫, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে বসে থাকেন। আলে হাযামের বাড়ি থেকে মুগীরার বাড়ি পর্যন্ত লাশবাহী খাটিয়া তিনি কাঁধে নেন এবং সেখানে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) খাটিয়া কাঁধে নিয়ে কবর পর্যন্ত যান। অত:পর হযরত হাফসা (রা.)-এর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.) এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আসিম, সালিম, আবদুল্লাহ ও হামযা লাশ কবরে নামান।[২০০] ওফাতের পূর্বে তিনি ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.) কে ওসিয়ত করেন, পিতা তাঁকে গাবায় যে ভূ-সম্পত্তি দিয়ে যান তা যেন আল্লাহর রাস্তায় ওয়াক্ফ করে দেন।[২০১] তিনি কোনো সন্তান রেখে যাননি।[২০২]

---

[২০০] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৭-৪২৮

[২০১] *তাহযীবুত তাহযীব,* প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৩৯

[২০২] *শারহুল মাওয়াহিব,* যারকানী, কায়রো, ৩য় খন্ড, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযাইমা (রা.)

নাম যায়নাব। লকব উম্মুল মাসাকিন। তাঁর বংশধারা হচ্ছে- যায়নাব বিন্‌ত খুযাইমা ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদি মান্নাফ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমের ইব্‌ন সা'সা।[২০৩]

প্রথম থেকেই তিনি প্রশস্ত হৃদয় ও উদার হস্তের অধিকারিণী ছিলেন। ফকীর-মিসকীনদের সাহায্য করার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতেন এবং দরিদ্রদেরকে অত্যন্ত উদারতার সঙ্গে দান-সাদ্‌কা করতেন। এসকল গুনাবলীর কারণে তিনি সকলের কাছে 'উম্মুল মাসাকীন' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২০৪]

হযরত যায়নাব বিন্‌ত খুযাইমা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে কার সাথে হয় এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে এসব মতপার্থক্যের মধ্যে ইব্‌ন আবদিল বার ও ইবনুল আসীরের মতটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাদের মতে, রাসূল (স.)-এর ফুফাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়।[২০৫] হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ (রা.) ছিলেন একজন জালীলুল কাদর সাহাবী। তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি দু'আ করেছিলেন– "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এমন এক প্রতিপক্ষ দাও যে খুব বাহাদুর। আমি তোমার রাস্তায় যুদ্ধ করতে করতে তার হাতে নিহত হয়ে যাবো এবং সে আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি এ অবস্থায় তোমার সঙ্গে মিলিত হবো। তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে, হে আবদুল্লাহ! তোমার ঠোঁট, নাক ও কান কেন কাটা হয়েছে? আমি আরজ করবো, হে আল্লাহ! তোমার ও তোমার রাসূলের জন্য।"

---

[২০৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[২০৪] প্রাগুক্ত

[২০৫] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬৬

Dhaka University Institutional Repository

উহুদ যুদ্ধে তিনি এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে যুদ্ধ করেছিলেন যে, তরবারী ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (স.) তাঁকে খেজুরের একটি ডাল দিয়েছিলেন। তিনি এই ডালকে তরবারী হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাবেই যুদ্ধ করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কাফিররা তাঁর দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে বিচ্ছিন্ন করে লাশ বিকৃত করে ফেলে। আর এমনিভাবে তাঁর আকাঙ্খা পূরণ হয়।[২০৬] তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর ফুফু উমাইয়া বিন্ত আবদিল মুত্তালিবের ছেলে। স্বামীর এমন মৃত্যুতে হযরত যায়নাব (রা.) খুবই মর্মাহত হন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ (রা.)-এর শাহাদাতের পর সেই বছরেই রমযান মাসের প্রথম দিকে রাসূল (স.) হযরত যায়নাব বিন্ত খুযাইমা (রা.) কে বিয়ে করেন এবং ১২ আউকিয়া সোনা মাহর বাবদ প্রদান করেন। ইব্ন হিশাম বলেন, চার'শো দিরহাম দেন মাহরের বিনিময়ে রাসূল (স.) তাঁকে বিয়ে করেন।[২০৭] এ বিয়ের মধ্যস্থতা করেন হযরত কুবাইসা ইব্ন আমর আল-হিলালী (রা.)।[২০৮] সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৩০ বছর।

রাসূল (স.)-এর সঙ্গে বিয়ের ২/৩ মাসের মধ্যেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[২০৯] ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে, ৮ মাস রাসূল (স.)-এর ঘর করার পর ৪র্থ হিজরীর রাবিউস সানী মাসের শেষ দিকে তিনি ইন্তিকাল করেন।[২১০]

হযরত খাদীজা (রা.)-এর পর হযরত যায়নাব বিন্ত খুযাইমা (রা.)ই রাসূল (স.)-এর স্ত্রীদের মধ্যে তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। অন্যান্য স্ত্রীগণ রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর ইন্তিকাল করেন। রাসূল কারীম (স.) স্বয়ং তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং মদীনায় জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করেন।[২১১]

---

[২০৬] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

[২০৭] *আস্-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ,* ইব্ন হিশাম, দারুল কুতুব মিসরিয়া, মিশর, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪৭

[২০৮] প্রাগুক্ত

[২০৯] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৮

[২১০] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৯

[২১১] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সালামা বিন্ত আবী উমাইয়া (রা.)

উম্মুল মু'মি্নীন হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর প্রকৃত নাম হিন্দা। উম্মু সালামা কুনিয়াত এবং এ নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।[২১২] তাঁর বংশধারা হলো- হিন্দা বিন্ত আবী উমাইয়্যা ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন ওমার ইব্ন মাখযুম।[২১৩] তাঁর পিতার আসল নাম হুযাইফা, অন্যমতে সুহায়ল।[২১৪] হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর মাতৃকুলের বংশধারা হলো- আতীকা বিন্ত আমের ইব্ন রাবী'আ ইব্ন মালিক ইব্ন জাযীমা ইব্ন আলকামা ইব্ন ফারাস ইব্ন গানাম ইব্ন মালিক ইব্ন কিনানা।[২১৫]

হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে পারিপার্শ্বিক বর্ণনা হতে বুঝা যায় যে, নবী (স.)-এর নবুওয়্যাত লাভের সময় তিনি বালিগা ছিলেন।[২১৬]

হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল আসাদ আল-মাখযুমীর সাথে। যার ডাকনাম আবূ সালামা এবং তিনি এ নামেই পরিচিত। তিনি অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন। রাসূল কারীম (স.) যখন ইসলামের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন তাঁর মতো পবিত্র স্বভাবের মানুষের পক্ষে এই দাওয়াতে সাড়া না দেওয়াটা অস্বাভাবিক ছিল। তিনি নিজের গোত্রের বিরোধিতা ও অন্যান্য মুসিবাত মাথায় নিয়ে কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মু সালামাও সেই যুগেই

---

[২১২] *আনসাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২০৭, ৪২৯
[২১৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
[২১৪] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৮৩
[২১৫] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৬
[২১৬] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম গ্রহণ করেন।[২১৭] তাঁদেরকে 'কাদীমূল ইসলাম' বা প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে পর্যায়ভুক্ত করা হয়ে থাকে।[২১৮]

ইসলাম গ্রহণের পর বানু মাখযুম হযরত আবূ সালামা (রা.)-এর উপর নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন চালালে তিনি পালিয়ে আবূ তালিবের গৃহে আশ্রয় নেন।[২১৯] সেখানেই সালামা নামে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে।[২২০] হিজরাতের নির্দেশ হলে তিনি সস্ত্রীক হাবশায় হিজরাত করেন।[২২১]

হাবশায় কিছু দিন অবস্থান করার পর তাঁরা পুনরায় মক্কায় ফিরে আসেন। তারপর আবার মদীনায় হিজরাত করেন। কিন্তু উম্মু সালামা (রা.)-এর মদীনা হিজরাতের যাত্রা ছিল অত্যন্ত বন্ধুর ও হৃদয় বিদারক। তখন হযরত আবূ সালামা (রা.)-এর নিকট শুধু একটি উট ছিল। তার উপর তিনি হযরত উম্মু সালামা (রা.) এবং শিশুপুত্র সালামাকে চড়ালেন ও নিজে উটের রশি ধরে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই উম্মু সালামা (রা.)-এর বংশ বানু মুগীরাহর লোকজন একথা জানতে পারল। তাঁরা এসে উট ঘিরে দাঁড়ালো এবং আবূ সালামা (রা.)কে বললো–তুমি যেতে পারো। কিন্তু আমাদের মেয়েকে তোমার সাথে যেতে দিতে পারি না। এ কথা বলে তারা আবূ সালামা (রা.)-এর হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিল এবং হযরত উম্মু সালামা (রা.)কে জোরপূর্বক নিজেদের সাথে নিয়ে চললো। ইত্যবসরে আবূ সালামা (রা.)-এর বংশের লোকেরা এসে সেখানে পৌঁছালো। তারা উম্মু সালামা (রা.)-এর শিশুপুত্র সালামাকে হস্তগত করলো এবং বানু মুগীরাহকে বললো– তোমরা যদি নিজেদের মেয়েকে আবূ সালামা (রা.)-এর সঙ্গে যেতে না

---

[২১৭] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[২১৮] *আল ইসাবা,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৪০

[২১৯] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২২৮

[২২০] *আল-ইসাবা,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৪০

[২২১] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

দাও তাহলে আমরা আমাদের বংশের শিশুপুত্রকে তোমাদের কাছে দেব না। তারা আবূ সালামা (রা.)কে বললো– একাকী তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।

হযরত আবূ সালামা (রা.) স্ত্রী ও পুত্র ছাড়াই মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) বানু মুগীরাহর নিকট এবং তাঁর শিশুপুত্র বানু আবদিল আসাদের নিকট রয়ে গেল। দ্বীনে হকের খাতিরে পিতা, পুত্র ও স্ত্রী তিনজন বিচ্ছিন্নতার মুসিবত সহ্য করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই হযরত উম্মু সালামা (রা.) স্বামী ও শিশুপুত্রের নিকট থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের হয়ে সারাদিন আবতাহ উপত্যকায় একটি টিলার উপর বসে সন্ধা পর্যন্ত কান্নাকাটি করতেন। এভাবে পুরো একটি বছর কেটে গেল।

একদিন বানু মুগীরাহর জনৈক প্রভাবশালী ও রহমদিল ব্যক্তি তাঁকে এ অবস্থায় দেখে খুবই কষ্ট পেলেন। তিনি বানু মুগীরাহর লোকদের একত্র করে তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন– 'এই মেয়ে আমাদেরই রক্তের অংশবিশেষ। আমরা কতদিন এই অসহায়কে স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো। হে বানু মুগীরাহ! আল্লাহর কসম, আমাদের বংশ সম্ভ্রান্ত ও সাহসী। তারা যুল্মকে কখনো ভালো জানে না। এ ব্যক্তির বক্তৃতা শুনে অন্যদের মনেও দয়ার উদ্রেক হলো, তারা হযরত উম্মু সালামা (রা.)কে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিল। বানু আবদিল আসাদ যখন এই ঘটনা শুনলো তখন তাদের মনেও দয়া হলো এবং শিশুপুত্র সালামাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলো। উম্মু সালামা (রা.) শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে উটে সাওয়ার হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে তান'ঈম নামক স্থানে কাবার চাবি রক্ষক উসমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবী তালহার সঙ্গে সাক্ষাত ঘটলো। তিনি যখন উম্মু সালামা (রা.)কে শিশুপুত্রসহ একাকী সফর করতে দেখলেন, তখন উটের রশি ধরলেন এবং টানতে টানতে মদীনার দিকে অগ্রসর হলেন। যখনই কোথাও বিশ্রাম নিতেন তখন তিনি কোনো বৃক্ষের পাশে চলে যেতেন এবং চলার সময় উট প্রস্তুত করে নিয়ে আসতেন। এভাবে চলতে চলতে তাঁরা কুবা পৌঁছলেন। হযরত আবূ সালামা (রা.) সেখানেই অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

করছিলেন। উসমান ইব্ন তালহা সেখান থেকে মক্কায় ফিরে গেলেন এবং হযরত উম্মু সালামা (রা.) বিচ্ছিন্ন স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন।[২২২]

স্বামীর সংসার হযরত উম্মু সালামার ভাগ্যে বেশিদিন জোটেনি। তাঁর স্বামী হযরত আবূ সালামা (রা.) ছিলেন নামকরা যোদ্ধা। তিনি তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে প্রতিপক্ষের আবূ সালামা হাশমীর নিক্ষিপ্ত একটি তীরে তাঁর বাহু আহত হয় এবং এক মাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান।[২২৩] এর কিছুদিন পর রাসূল (স.) তাঁকে 'কাতান' অভিযানে প্রেরণ করেন এবং সেখানে ২৯ দিন থাকার পর ৪র্থ হিজরী সনের সফর মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। তখন পুরনো ক্ষতস্থানে আবার ব্যাথা দেখা দেয় এবং এই ব্যাথার কষ্টেই তিনি সেই বছর জমাদিউস সানী মাসের ৯ তারিখ ইন্তিকাল করেন।[২২৪]

হযরত আবূ সালামা (রা.) যখন ইন্তিকাল করেন তখন হযরত উম্মু সালামা (রা.) অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সন্তান প্রসবের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর কথা চিন্তা করে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[২২৫] হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর দুঃখ-কষ্ট রাসূল (স.)-এর অনুভূতিকেও তীব্রভাবে নাড়া দিতে থাকে। তাই রাসূল কারীম (স.) হযরত ওমার (রা.)-এর মাধ্যমে উম্মু সালামা (রা.)-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হযরত উম্মু সালামা (রা.) এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ৪র্থ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে বিয়ে সু-সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর ৬ষ্ঠ স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুতে তিনি যে দুঃখ পেয়েছিলেন, রাসূল কারীম (স.)-এর সাথে বিয়ের মাধ্যমে তা লাঘব হয়ে যায়। তিনি পূর্ব স্বামী হতেও উত্তম বিকল্প লাভ করেন।

---

[২২২] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫২

[২২৩] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৮

[২২৪] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৭

[২২৫] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) হযরত উম্মু সালামা (রা.)কে খুরমার বাকল ভরা একটি চামড়ার বালিশ, দু'টি মশ্‌ক এবং আটা পেষার দু'টি যাঁতা প্রদান করেছিলেন। এসকল জিনিস তিনি অন্য স্ত্রীগণকেও প্রদান করেছিলেন।[২২৬]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) একজন লজ্জাবতী ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্না নারী। তাই দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিক হতে তাঁর একটু বিলম্ব হয়। প্রথম দিকে যখনই রাসূল (স.) গৃহে আসতেন, তিনি শিশুকন্যা যায়নাবকে দুধ পান করাতে শুরু করতেন। এ অবস্থা দেখে রাসূল (স.) সামান্য হেসে ফিরে যেতেন। হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.) ছিলেন উম্মু সালামা (রা.)-এর দুধভাই। তিনি যায়নাবকে নিজের কাছে নিয়ে যান। এরপর রাসূল (স.) উম্মু সালামা (রা.)-এর ঘরে আসেন এবং শিশু কন্যাকে না দেখে জিজ্ঞেস করেন– যায়নাব কোথায়? তিনি উত্তর দিলেন– আম্মার এসে নিয়ে গেছে। সেদিন থেকে রাসূল (স.) অবস্থান করতে থাকেন।[২২৭] এরপর রাসূল (স.)-এর সাথে তাঁর সম্পর্ক এত গভীর হয় যে, হযরত আয়িশা (রা.)-এর পরেই তাঁর স্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

খন্দক যুদ্ধে হযরত উম্মু সালামা (রা.) অংশগ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি রাসূল (স.)-এর এতো কাছে ছিলেন যে, তাঁর প্রতিটি কথা ভালোমত শুনতে পেতেন। তিনি বলতেন– আমার সেই সময়ের কথা খুব ভালো স্মরণে আছে, যখন রাসূল (স.)-এর পবিত্র বুকে ধুলোবালি লেগে ছিল। তিনি লোকদের মাথায় ইট উঠিয়ে দিচ্ছিলেন, আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। হঠাৎ আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন– হে ইব্‌ন সুমাইয়া! তোমাকে একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী কতল করবে।[২২৮]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) বিভিন্ন সময়ে রাসূল (স.)কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

---

[২২৬] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯০

[২২৭] প্রাগুক্ত

[২২৮] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৩৬-২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করতেন। বিশেষ করে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে রাসূল (স.)কে যে পরামর্শ দেন তা অত্যন্ত যুগান্তকারী ও যুগোপযোগী। সন্ধি চুক্তির পর রাসূল (স.) সাহাবীদেরকে নিজ নিজ পশু কুরবানী করতে নির্দেশ দিলেন। সন্ধির শর্তাবলী বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ছিল বলে মুসলমানরা ছিল বিষন্ন। ভগ্নহৃদয় সাহাবীরা কুরবানী প্রদানে কিছুটা চিন্তা-ভাবনা করলেন। রাসূল (স.) এতে পেরেশান হলেন। তিনি তাবুতে ফিরে গিয়ে হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর কাছে বিষয়টি খুলে বললেন। এ সময় হযরত উম্মু সালামা পরামর্শ দিয়ে বলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাহাবীগণ আপনার নির্দেশ ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। আপনি নিজে বাইরে বেরিয়ে কুরবানী করুন এবং ইহরাম ত্যাগের নিয়্যাতে মাথার চুল কেটে ফেলুন।' রাসূল (স.) উম্মু সালামা (রা.)-এর পরামর্শ কবুল করে কাউকে কিছু না বলে নিজেই কুরবানী করলেন এবং ইহরাম খুলে ফেললেন। সাহাবায়ে কিরাম যখন দেখলেন যে, রাসূল (স.)-এর নির্দেশ অপরিবর্তনীয় তখন সবাই কুরবানী করে ইহরাম ভঙ্গ করে মাথার চুল কেটে ফেললেন।[২২৯]

হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর এ পরামর্শ এক কঠিন সমস্যাকে নিমিষেই সমাধান করে দেয়। নারী জাতির ইতিহাসে সঠিক পরামর্শ দানের এত বড় দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উম্মু সালামা (রা.) রাসূল (সা.)-এর সফর সঙ্গীনী ছিলেন। তায়িফ অভিযানের সময় তিনি রাসূল (স.)-এর সঙ্গে ছিলেন। উম্মু সালামা (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি রাসূল (স.)-এর সফর সঙ্গী হন। তাওয়াফের ব্যাপারে রাসূল (স.) তাঁকে বললেন– উম্মু সালামা! ফজরের নামাজের সময়ে তুমি উটের উপর সওয়ার হয়ে তাওয়াফ করে নিবে। তিনি তাই করেছিলেন।[২৩০]

হাদীস শোনার ব্যাপারে হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর খুব আগ্রহ ছিল। একদিন

---

[২২৯] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৯
[২৩০] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৮০

Dhaka University Institutional Repository

তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল (স.) মসজিদে মিম্বরের উপর তাশরীফ আনলেন এবং খুতবা প্রদান শুরু করলেন। তিনি কেবল 'হে মানবমন্ডলী!' বলেছেন, এমন সময় হযরত উম্মু সালামা (রা.) চুল বিন্যস্তকারিণীকে বললেন– 'চুল বেঁধে দাও।' সে বললো– এত তাড়া কিসের! রাসূল (স.) তো সবেমাত্র 'হে মানবমন্ডলী!' বলেছেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিজের চুল স্বয়ং বাঁধলেন এবং বললেন– আমরা কি মানবমন্ডলীর মধ্যে পরিগণিত নই! অত:পর অত্যন্ত মনোযোগের সাথে খুতবা শুনলেন।[২৩১]

তিনি রাসূল (স.)-এর নির্দেশাবলী পালনে সীমাহীন যত্নবান ছিলেন। একবার তিনি একটি হার পরিধান করেছিলেন। এই হারে কিছুটা স্বর্ণ ছিল। যার কারণে রাসূল (স.) পছন্দ করলেন না। ফলে তিনি তা খুলে ফেললেন অথবা ভেঙে ফেললেন।[২৩২]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) খুব সুন্দর করে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারতেন। একবার জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে জানতে চায়, রাসূল (স.) কিরা'আত পড়তেন কীভাবে? তিনি বললেন– রাসূল (স.) এক একটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পড়তেন। তারপর তিনি নিজেই কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শুনিয়ে দেন।[২৩৩]

তিনি শারঈ বিভিন্ন বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমাধান দিতে পারতেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম বলেন– 'যদি তাঁর ফাতওয়া সংগ্রহ করা হয়, তবে ছোট-খাটো একটি পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।' ইমামুল হারামাইন বলেন– 'হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর চেয়ে বেশি সঠিক সিদ্ধান্ত দানের অধিকারিণী কোন নারী আমার দৃষ্টিতে পড়ে না।'

---

[২৩১] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[২৩২] প্রাগুক্ত

[২৩৩] *মুসনাদে আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩০০, ৩০২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.)– যাদের বলা হয় জ্ঞানের সাগর, তাঁরাও জানার জন্য হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর কাছে ধর্ণা দিতেন। তাবেঈদের বিরাট একটি দল তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন।[২৩৪]

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর ভূমিকা অনন্য। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আয়িশা (রা.)-এর পরেই তাঁর স্থান। তিনি তাঁর পূর্ব স্বামী হযরত আবূ সালামা, হযরত ফাতিমা (রা.) এবং রাসূল (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৩৫]

হযরত উম্মু সালামা (রা.) ৩৭৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ১৩ টি মুত্তাফাক আলাইহি। ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ৩টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) এককভাবে ১৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের ৩য় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস বর্ণনাকারী নারী সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়িশা (রা.) ব্যতিত তাঁর উপরে কেউ নেই।[২৩৬] হযরত উম্মু সালামা (রা.) হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন–তাঁর পুত্র ওমার ইব্ন আবূ সালামা, কন্যা যায়নাব বিন্ত আবূ সালামা, তাঁর ক্রীতদাস আবদুল্লাহ ইব্ন রাফী, নাফী, তার ভাই আমীর, ভাইয়ের ছেলে মুস'আব ইব্ন আবদিল্লাহ, ইব্ন সাফীনা, আবূ কাসীর, সাফিয়্যা বিন্ত শাইবা, খাযরা, হিন্দা বিন্ত হারীস, কাবীসা বিন্ত জুরাইব, আবূ উসমান নাহদী, আবূ ওয়ায়িল, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া, হুমাইদ, সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈ।[২৩৭]

---

[২৩৪] *মুসনাদে আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩১৩

[২৩৫] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ ২৪৩

[২৩৬] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১০

[২৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সালামা (রা.)-এর ওফাতের সময়কাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ওয়াকিদীর মতে, তিনি ৫৯ হিজরীতে শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। ইব্ন হিব্বান বলেন- ৬১ হিজরীর শেষের দিকে কারবালার ঘটনার পরে তিনি ইন্তিকাল করেন। অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, ৬৩ হিজরী সনে তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৩৮]

---

[২৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাস (রা.)

নাম- যায়নাব। কুনিয়াত- উম্মুল হাকাম। কুরাইশের আসাদ বিন খুযাইমা বংশের সঙ্গে তিনি সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তাঁর বংশধারা হলো– যায়নাব বিন্ত জাহাস ইব্ন রিয়াব ইব্ন লামির ইব্ন সাবরাতা ইব্ন মাররাতা ইব্ন কাসির ইব্ন গানাম ইব্ন দাওদান ইব্ন সাদ ইব্ন খুযাইমা। মাতার নাম ছিল উমাইয়া বিন্ত আবদিল মুত্তালিব। তিনি রাসূল (স.)-এর ফুফু ছিলেন। এদিক থেকে হযরত যায়নাব (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ফুফাতো বোন।[২৩৯]

হযরত যায়নাব (রা.) সেই সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, যারা আস-সাবিকুনা আউয়ালুন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ইব্নুল আসীর বলেন–

كانت قديمة الإسلام

'তিনি ছিলেন ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান।'[২৪০]

রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ১৩ বছর পর তিনি পরিবার-পরিজনের সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন।[২৪১]

হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) রাসূল (স.)-এর আযাদকৃত গোলাম ও পালিত পুত্র ছিলেন। প্রিয় নবী (স.) তাঁকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হযরত যায়নাব (রা.) এই সম্পর্ক পছন্দ করতেন না। এজন্য তিনি বিয়ের পূর্বে রাসূল (স.)-এর নিকট আরজ করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যায়িদকে আমি নিজের জন্য পছন্দ করিনা।' কিন্তু

---

[২৩৯] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২৪০] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৬৩

[২৪১] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) এই বিয়েতেই কল্যাণ মনে করতেন। এজন্য তাঁর ইচ্ছানুযায়ী হযরত যায়িদ (রা.)-এর বিয়ে হযরত যায়নাব (রা.)-এর সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল দেখা দেয়। প্রায় এক বছর পর হযরত যায়িদ (রা.) রাসূল (স.)-এর কাছে অভিযোগ করে বলেন–

إن زينب اشتد علي لسانها , وأنا أريد أن أطلقها

'হে আল্লাহর রাসূল! যায়নাব তাঁর কঠোর বাক্যবানে আমাকে বিদ্ধ করে। আমি তাঁকে তালাক দিতে চাই।'[২৪২]

রাসূল (স.) তাঁকে বুঝালেন যে, আল্লাহর নিকট তালাক পছন্দনীয় কাজ নয়। পবিত্র কুরআন মাজীদে তা এভাবে বলা হয়েছে–

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

"হে নবী! সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আপনি সেই ব্যক্তিকে, যার প্রতি আল্লাহ ও আপনি অনুগ্রহ করেছিলেন, বলেছিলেন যে, তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।"[২৪৩] কিন্তু উভয়ের মাঝে শত চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পর্ক টিকলো না। শেষ পর্যন্ত, হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) হযরত যায়নাব (রা.)কে তালাক দিয়ে দিলেন।[২৪৪]

হযরত যায়নাব (রা.)-এর ইদ্দত পূর্ণ হলে রাসূল (স.) নিজেই তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু তখনও মুসলমানদের মানসিকতায় জাহেলী যুগের প্রথার প্রভাব অবশিষ্ট ছিল। জাহেলী সমাজ ঔরসজাত পুত্র ও পালিত পুত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতো না।

---

[২৪২] *ফাতহুল বারী,* ইব্ন হাজার আসকালানী, বাবুল হালাবী, কায়রো, ১৩৭৮/১৯৫৯, ৮ম খন্ড, পৃ. ৪০৩

[২৪৩] *আল-কুরআন,* সূরা আল-আহযাবঃ ৩৮

[২৪৪] *আনসাবুল আশরাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আর হযরত যায়িদ (রা.) রাসূল (স.)-এর পালিত পুত্র ছিলেন এবং মানুষের মধ্যে যায়িদ ইব্ন মুহাম্মদ (রা.) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এজন্য মুনাফিক ও কাফিরদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (স.) এ বিয়েতে কিছুটা চিন্তাগ্রস্ত হলেন। তখন রাসূল (স.) হযরত যায়নাবকে বিয়ে করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

'যখন আপনি নিজের মনে সেই কথা লুকিয়ে ছিলেন, যা আল্লাহ্ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। আপনি মানুষকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকে ভয় করা আপনার জন্য অধিকতর সঙ্গত।'[২৪৫]

সুতরাং এখন আর কোনো বস্তুই নিষেধকারী ছিল না। রাসূল (স.) হযরত যায়িদ (রা.)কেই হযরত যায়নাব (রা.)-এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠান। হযরত যায়িদ (রা.) হযরত যায়নাব (রা.)-এর গৃহে গেলেন এবং বললেন– 'হে যায়নাব! তোমার জন্য সুখবর যে মহানবী (স.) তোমার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন ও তোমার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি তোমাকে বিয়ে করতে চান।' আল্লাহ্ তাআলা এ মর্মে রাসূল (স.) এর নিকট ওহী নাযিল করলেন–

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

"পরে যায়িদ যখন তার নিকট থেকে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিল, তখন আমরা তাকে (তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে) তোমার সাথে বিয়ে দিলাম।"[২৪৬]

মহান আল্লাহ যেন নিজে রাসূল (স.)-এর সঙ্গে হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিয়ে দিয়ে দিলেন। এরপর রাসূল (স.) হযরত যায়নাব (রা.)-এর গৃহে গমন করেন এবং বিনা

---

[২৪৫] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাবঃ ৩৫

[২৪৬] আল-কুরআন, সূরা আল-আহযাবঃ ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুমতিতে ভেতরে চলে গেলেন।[২৪৭]

সকালে ওয়ালিমার দাওয়াত হলো। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন– 'হযরত যায়নাব (রা.)-কে বিয়ে করার পর রাসূল (স.) যে রকম ভূরিভোজের আয়োজন করেছিলেন, আমি তাঁর আর কোন স্ত্রীকে বিয়ের ক্ষেত্রে সেরকম দেখিনি। তিনি একটি ভেড়া যবেহ করে ভোজ দিয়েছিলেন।[২৪৮] এ অনুষ্ঠানে ৩০০ মানুষকে রুটি ও গোশত দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়েছিল।

হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলঃ

১. জাহেলী যুগে পালিত পুত্র ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদা প্রাপ্তির প্রথা ছিল। এই প্রথা বাতিল হয়ে যায়।
২. লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, কাউকে প্রকৃত পিতা ছাড়া অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না।
৩. আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিলের মাধ্যমে হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিয়ের ব্যবস্থা করেন।
৪. এ বিয়ের ওয়ালিমা হয় জাঁকজমকপূর্ণ।
৫. এই সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

এই সব বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত যায়নাব (রা.) রাসূল (স.)-এর অন্য স্ত্রীগণের সামনে গর্ব করতেন।

রাসূল (স.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত যায়নাব (রা.)ই হযরত আয়িশা (রা.)-এর সমকক্ষমতা দাবি করতে পারতেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং হযরত আয়িশা (রা.) মন্তব্য

---

[২৪৭] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৭

[২৪৮] *আসাহ আস-সিয়ার,* আবদুর রউফ দানাপুরী, করাচি, পৃ. ৬২২

Dhaka University Institutional Repository

করেন– 'রাসূল (স.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত যায়নাবই আমার সমকক্ষতার দাবিদার ছিলেন।'[২৪৯]

হযরত যায়নাব (রা.) অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, সুস্পষ্টবাদী এবং কল্যাণকামী ছিলেন। রাসূল (স.) স্বয়ং তাঁর ইবাদাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। একবার রাসূল (স.) মুহাজিরদের একটি দলের মধ্যে গনিমতের মাল বন্টন করছিলেন। এ সময় হযরত যায়নাব (রা.)ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি এমন এক কথা বললেন যা হযরত ওমার (রা.)-এর নিকট অসহনীয় ছিল। হযরত ওমার (রা.) অত্যন্ত কড়া ভাষায় হযরত যায়নাব (রা.)কে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে নিষেধ করলেন। এ সময় রাসূল (স.) বললেন– 'ওমার! তাকে কিছু বলো না। সে বড় ইবাদতগুজার এবং আল্লাহকে ভয় করে থাকে।'[২৫০]

হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর দ্বীনদারী সম্পর্কে বলেন– 'দ্বীনদারী, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগে হযরত যায়নাব (রা.)-এর চেয়ে উত্তম মহিলা আর কেউ ছিল না।[২৫১]

হযরত যায়নাব (রা.) ছিলেন খুবই দানশীল, মুক্তহস্ত, আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল ও অল্পে তুষ্ট মহিলা। ইয়াতিম, দুস্থ ও অভাবগ্রস্তদের আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল বলে বিবেচিত হতেন। ইব্‌ন সা'দ তার সম্পর্কে বর্ণনা করেন–

'যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ দিরহাম-দিনার কিছুই রেখে যাননি। যা কিছুই তার হাতে আসতো দান করে দিতেন। তিনি ছিলেন গরীব-মিসকীনদের আশ্রয়স্থল।'[২৫২]

---

[২৪৯] *সিয়ারু আ'লাম আন্‌-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১১

[২৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[২৫১] *মুসনাদে আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৫১

[২৫২] *আত্‌-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নাব (রা.) একজন হস্তশিল্পী ছিলেন। তিনি চামড়া পাকাকরণের কাজ জানতেন। এই কাজে যা আয় হতো তা তিনি অভাবী মানুষদের দান করে দিতেন।

হযরত যায়নাব (রা.) হাতে সুতা কেটে রাসূল (স.)-এর যুদ্ধবন্দীদেরকে দিতেন। আর তারা কাপড় বুনতো। রাসূল (স.) যুদ্ধের কাজে তা ব্যবহার করতেন।[২৫৩]

একবার রাসূল (স.)-এর স্ত্রীদের কযেকজন রাসূল (স.)কে জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের মধ্যে কে আপনার পরে সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করবে? রাসূল (স.) বললেন, যার হাত সবচেয়ে দীর্ঘ। একথা শুনে তাঁরা একটি কাঠি দিয়ে নিজেদের হাত মাপতে শুরু করলেন। দেখা গেল, হযরত সাওদা (রা.)-এর হাত সব চেয়ে দীর্ঘ। কিন্তু যখন সবার মধ্যে হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) প্রথমে ইন্তিকাল করলেন, তখন তাঁরা জানতে পারলেন যে, রাসূল (স.) দীর্ঘ হাতকে দানের প্রতীক হিসেবে বুঝিয়েছেন। তিনিই রাসূল (স.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে প্রথম ইন্তিকাল করেন।[২৫৪]

হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন নারী সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূল (স.) থেকে ১১ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ২টি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৫৫] হযরত যায়নাব (রা.) থেকে যে সকল সাহাবী ও তাবেঈ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– হযরত হাবীবা বিন্ত আবী সুফিয়ান, যায়নাব বিনত আবী সালামা, মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন জাহাশ, কুলসুম বিন্ত মুসতালাক এবং দাস মাজকুর উল্লেখযোগ্য।[২৫৬]

---

[২৫৩] *হায়াতুস সাহাবা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৯

[২৫৪] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১০৮

[২৫৫] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৮

[২৫৬] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২০ হিজরীতে হযরত ওমার ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে ৫৩ বছর বয়সে হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) মদীনায় ইন্তিকাল করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দানের স্বভাব বিদ্যমান ছিল। যার কারণে তাঁর ইন্তিকালে মদীনার ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে শোকের বন্যা বয়ে যায়। তিনি নিজের কাফনের ব্যবস্থা নিজেই করে যান। রাসূল (স.)কে যে খাটিয়াতে করে কবরের কাছে নেওয়া হয়েছিল, তাঁকেও যেন সেই খাটিয়াতে বহন করা হয়– মৃত্যুর আগে তিনি এ ব্যাপারে ওসিয়ত করে যান। তিনিই প্রথম মহিলা যাকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পরে এই খাটিয়ায় বহন করা হয়। রাসূল (স.)-এর অন্য স্ত্রীগণ তাঁকে গোসল দেন।[২৫৭]

খলীফা হযরত ওমার (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মুহাম্মদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন জাহাশ, উসামা ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন জাহাশ, উসামা ইব্ন যায়িদ, আবদুল্লাহ ইব্ন তালহা (রা.) তাঁর লাশ কবরে নামান। তাঁরা সকলেই ছিলেন হযরত যায়নাব বিনত জাহাশ (রা.)-এর আত্মীয়-স্বজন। মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৫৮]

হযরত জুওয়াইরিয়া বিন্ত হারিস (রা.)

নাম জুওয়াইরিয়া। পূর্ব নাম ছিল বাররা। রাসূল (স.) তা পরিবর্তন করে জুওয়াইরিয়া নাম রাখেন।[২৫৯] তাঁর বংশধারা হলো– জুওয়াইরিয়া বিন্ত হারিস ইব্ন আবী জিরার ইব্ন হাবীব ইব্ন আইজ ইব্ন মালিক ইব্ন জাযীমা ইব্ন মুসতালিক। হযরত জুওয়াইরিয়া ছিলেন আররেব বিখ্যাত খুযা'আ গোত্রের মুসতালিক' শাখার কন্যা। পিতা হারিস ছিলেন বনু মুসতালিকের নেতা।[২৬০]

---

[২৫৭] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৬

[২৫৮] *সহীহ আল-বুখারী,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯১

[২৫৯] *আল-ইস্‌তিয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* আবূ ওমার ইউসুফ ইব্ন আবদিল বার, দারুল নাহদাতিল মিসরিয়া, কায়রো, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮০৫

[২৬০] *সিয়ারু আ'লাম আন্‌-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল চাচাতো ভাই মুসাফি ইব্ন সাফওয়ানের সাথে। পিতা হারিস এবং স্বামী মুসাফি উভয়েই ছিলেন ইসলামের চরম শত্রু।

তাঁর পিতা হারিস কুরাইশদের প্ররোচনায় নিজের এবং অন্য আরব গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। রাসূল (স.) এই সংবাদ পেয়ে ৫ম হিজরী সনের ২ শাবান মুজাহিদদের একটি দল সঙ্গে নিয়ে বানু মুসতালিকের দিকে রওয়ানা দিলেন। হারিস মুসলমানদের অগ্রযাত্রার খবর পেয়ে পালিয়ে গেলেন। রাসূল (স.) মুরাইসিয়া নামক স্থানে অবস্থান নিলেন। এখানকার বাসিন্দারা মুসলমানদের মুকাবিলা করলো। কিন্তু পরাজিত হলো। তাদের ১১ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় ৬০০ লোক বন্দি হয়। এই বন্দিদের মধ্যে জুওয়াইরিয়া (রা.)ও ছিলেন। গনিমতের মাল বন্টনের পর তিনি সাবিত ইব্ন কায়িস (রা.)-এর ভাগে পড়েন। বস্তুত তিনি ছিলেন গোত্রীয় নেতার কন্যা। এজন্য দাসী হিসেবে থাকা তাঁর জন্য অসহনীয় হয়ে উঠলো। তিনি হযরত সাবিত (রা.)-এর নিকট অর্থ নিয়ে মুক্ত করে দেয়ার নিবেদন জানালেন। তাতে তিনি সম্মত হলেন এবং ৯ উকিয়া স্বর্ণ দাবি করলেন।[২৬১]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূল (স.)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং আরজ করলেন- 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি। আমি বিপদে পড়েছি। নিজেকে মুক্ত করতে চাই, আপনি আমায় সাহায্য করুন।'

---

[২৬১] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) বললেন- তুমি কি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করনা? হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বললেন– তা কি? রাসূল (স.) বললেন– 'আমি তোমার মুক্তিপণ পরিশোধ করে তোমাকে বিয়ে করলে তা কি উত্তম হবে না?' হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) তৎক্ষণাৎ সম্মতি প্রকাশ করেন। রাসূল (স.) বিনিময় মূল্য আদায় করে দাসত্ব থেকে মুক্ত করেন। তারপর তাঁকে বিয়ে করে স্বাধীন স্ত্রীর মর্যাদা দান করেন।[২৬২]

এদিকে বিয়ের সংবাদ যখন মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। তখন তাঁরা পরামর্শ করে একজোট হয়ে বানু মুসতালিকের সমস্ত বন্দিকে মুক্ত করে দেন। ইব্নুল আসীর (র.) বর্ণনা করেছেন যে, এ সময় বানু মুসতালিকের এক'শ পরিবারের সকল বন্দি মুক্তি পায়। এই ঘটনা প্রসঙ্গে হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন- 'আমি কোনো নারীকে তার সম্প্রদায়ের জন্য জুওয়াইরিয়া (রা.) থেকে অধিকতর কল্যাণকামী দেখিনি।'[২৬৩]

ইব্নুল আসীর (র.) বর্ণনা করেন, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূল (স.) স্ত্রী হিসেবে ঘর করা শুরু করেছেন, পিতা হারিস তা জানতো না। হারিস খবর পেয়েছিলেন যে, তাঁর কন্যাকে দাসী বানানো হয়েছে। তাই তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের উপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনার দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে 'আকীক' নামক উপত্যকায় দু'টি পছন্দনীয় উট কোনো ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট এবং সম্পদ ও আসবাবপত্রসহ মদীনা পৌঁছলেন। অত:পর রাসূল (স.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন- 'আপনি আমার কন্যাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছেন। এসব মালামাল ও আসবাবপত্র নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিন। রাসূল (স.) ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, এই ব্যক্তি দু'টি উট লুকিয়ে রেখে এসেছে। তাই রাসূল (স.) তাঁর কাছে

---

[২৬২] *আল-ইস্তি'য়াব,* প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮০৪
[২৬৩] *উসুদুল গাবা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

জানতে চাইলেন 'সেই উট দু'টি কোথায়, যাদেরকে আকীক উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে এসেছো?' তাঁর এ গোপন তথ্য রাসূলুল্লাহ (স.) জানতে পেরেছেন, একথা বুঝে হারিস দারুন বিস্মিত হলেন। তিনি সাথে সাথে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান।

তারপর যখন তাঁকে বলা হলো যে, যাকে তিনি মুক্ত করতে ছুটে এসেছেন। তাঁকে দাসী বানানো হয়নি বরং তাঁকে নবী গৃহের শোভায় পরিণত করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং কন্যা হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বাড়ি ফিরে যান।[২৬৪] এ বিয়ের দেন মাহর সম্পর্কে ইব্ন সা'দ উল্লেখ করেছেন–

وجعل صداقها عتق كل مملوك من بني المصطلق

'বানু মুসতালিকের প্রতিটি বন্দির মুক্তি তাঁর মাহর হিসেবে ধার্য হয়।'[২৬৫]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) কে বিয়ে করার পশ্চাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারই ছিল প্রধান। রাসূল (স.) তাঁর সুগভীর দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, যদি এই গোত্রের সর্দারের কন্যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা যায় তবে মুসলমানদের সাথে বানু মুসতালিক গোত্রের শত্রুতার অবসান ঘটবে। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। এ বিয়ের পর বানু মুসতালিকের কেউ কোনদিন মুসলমানদের বিরোধিতা করেনি। বরং ধীরে ধীরে তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন।[২৬৬]

যখন রাসূল (স.)-এর সাথে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-এর বিয়ে হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। তিনি ছিলেন যথেষ্ট রূপবতী এবং চাল-চলন ছিল খুবই মিষ্টি-মধুর। হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন– 'হযরত জুওয়াইরিয়া

---

[২৬৪] প্রাগুক্ত
[২৬৫] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬২
[২৬৬] *হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৪

Dhaka University Institutional Repository

(রা.)-এর মধ্যে মধুরতা ও ছলাকলা উভয় রকমের গুন বিদ্যমান ছিল। কেউ তাঁকে দেখলেই তাঁর অন্তরে স্থান করে নিতেন।'[২৬৭]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি ছিলেন একাগ্রচিত্ত। রাসূল (স.) যখনই তাঁর গৃহে আগমন করতেন। তখনই তাঁকে ইবাদাতে মগ্ন দেখতেন। একদিন রাসূল (স.) তাঁকে মসজিদে সকালে ইবাদাতে মগ্ন অবস্থায় দেখলেন। দুপুরে তিনি সেদিক দিয়ে পুনরায় যাওয়ার সময় হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)কে একই অবস্থায় দেখতে পেলেন, রাসূল (স.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি সর্বদা এইভাবে ইবাদাত করে থাকো? সেই অবস্থায় তিনি 'হ্যাঁ' বলে উত্তর দিলেন। তখন রাসূল (স.) বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখাবো না, যা তোমার এই নফল ইবাদাত থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপর রাসূল (স.) তাঁকে এ দু'আ শিক্ষা দেন- [২৬৮]

سبحان الله وبحمده عدد خلقه

ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته

রাসূল (স.) হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)কে গভীরভাবে মহব্বত করতেন। সবসসময় তাঁর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। একবার রাসূল (স.) তাঁর ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন- খাবার কোনো জিনিস আছে কি? তিনি জবাব দিলেন- আমার দাসী কিছু সাদকার গোশত দিয়েছিল। তাই আছে। তাছাড়া আর কিছু নেই। রাসূল (স.) বললেন- তাই নিয়ে এসো। কারণ যাকে সাদ্কা দেয়া হয়েছিল তা তার নিকট পৌঁছে গেছে।[২৬৯]

---

[২৬৭] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৭৭

[২৬৮] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩২৪

[২৬৯] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) রাসূল (স.) থেকে ৭টি হাদীস রেওয়ায়েত করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২৭০] তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে–আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন ওমার, জাবির, ওবাইদ ইব্ন আস্-সাবাক, তুফাইল, আবূ আইউব মুরাগী, মুজাহিদ, কুরাইব, কুলসুম ইব্ন মুসতালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৭১]

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) ৫০ হিজরী সনে রবিউল আউয়াল মাসে ৬৫ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[২৭২]

---

[২৭০] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৬৩

[২৭১] *আল-ইসাবা,* প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৬৬

[২৭২] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফিয়ান (রা.)

নাম রামলা। কেউ কেউ বলেছেন- তাঁর নাম ছিল হিন্দা। কুনিয়াত উম্মু হাবীবা। এ নামেই তিনি পরিচিতি পেয়েছেন। তাঁর বংশনাম হলো- উম্মু হাবীবা বিন্‌ত আবী সুফিয়ান ইব্‌ন হার্‌ব ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদি শামস। তাঁর মাতার নাম- সুফিয়া বিন্‌ত আবিল আস। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর ফুফু ছিলেন।[২৭৩] হযরত মু'আবিয়া (রা.) হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-এর সৎভাই ছিলেন। মু'আবিয়া (রা.) উমাইয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ১৭ বছর পূর্বে উম্মু হাবীবা (রা.) মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন।[২৭৪]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)এর প্রথম বিয়ে হয় উম্মুল মু'মিনীন হযরত যায়নাব বিন্‌ত জাহাশ (রা.)-এর ভাই উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশের সঙ্গে।[২৭৫]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। কিন্তু উম্মু হাবীবা (রা.) ও স্বামী উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ইসলামের সূচনা পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল (স.) যখন মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরাতের নির্দেশ দেন তখন উম্মু হাবীবা (রা.) স্বামীসহ হিজরাত করে হাবশায় গমন করেন।

হাবশায় পৌঁছার কিছুদিন পর উবাইদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় এবং খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে মদ পান শুরু করে। হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) তাকে যথেষ্ঠ তিরস্কার করেন এবং তাকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই কাজ হলো না।

---

[২৭৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
[২৭৪] *আল-আসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩০৫
[২৭৫] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

সে খৃষ্টান থেকেই গেলো, এভাবে তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। একদিন উবাইদুল্লাহ ইব্ন জাহাশ অতিরিক্ত মদ পান অবস্থায় পড়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[২৭৬]

হাবশার মাটিতে উবাইদুল্লাহর ঔরসে উম্মু হাবীবা (রা.)-এর হাবীবা নামে এক সন্তানের জন্ম হয়। তিনিও সাহাবী ছিলেন। তাঁর নামের নিসবতেই তিনি উম্মু হাবীবা উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২৭৭]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) কন্যা হাবীবাকে নিয়ে হাবশায় বসবাস করতে থাকেন। মদীনায় মহানবী (স.)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলো। উম্মু হাবীবা (রা.)-এর ইদ্দাত পালন শেষ হলে রাসূল (স.) মদীনা থেকে আমার ইব্ন উমাইয়া দামরী (রা.)কে একটি পত্র এবং ৪০০ দীনার দেন মাহরের অর্থসহ হাবশায় সম্রাট নাজ্জাসীর নিকট বিয়ের পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেন। সম্রাট নাজ্জাসী তার দাসী আবরাহাকে উম্মু হাবীবা (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে বিয়ের পয়গাম পৌঁছে দেন। সম্রাট তাঁকে একথাও জানান যে, রাসূল (স.) আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে লিখেছেন। এখন আপনি একজন উকীল মনোনীত করুন। এই শুভ সংবাদ পেয়ে হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) খুব খুশি হয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি আবরাহাকে নিজের দু'টি রৌপ্যের চুড়ি, কানের দুল ও একটি নকশা করা আংটি উপহার দেন এবং মামাতো ভাই হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ ইব্ন আবিল আস (রা.) কে উকীল নিয়োগ করে নাজ্জাসীর নিকট পাঠান।[২৭৮]

সন্ধ্যায় নাজ্জাসী হাবশায় বসবাসরত হযরত জাফর ইব্ন আবি তালিব (রা.) এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে দরবারে ডেকে সবার উপস্থিতিতে বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেন।[২৭৯]

---

[২৭৬] *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৮

[২৭৭] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

[২৭৮] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯৮-৯৯

[২৭৯] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

৪০০ দীনার মাহরের অর্থ রাসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে খালিদ ইব্ন সাঈদের হাতে তুলে দেন। খালিদ ইব্ন সাঈদ উপস্থিত সবাইকে খাবার খাইয়ে বিদায় করেন।[২৮০]

বিয়ের কিছুদিন পর উম্মু হাবীবা (রা.) হাবশা থেকে মদীনা আগমন করেন। রাসূল (স.) এ সময় খায়বারের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরী মতান্তরে ৭ম হিজরীতে এ বিয়ে সংঘটিত হয়। তখন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-এর বয়স ছিল ৩৬ বছর বা ৩৭ বছর।[২৮১]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-এর এ বিয়ের খবর মক্কায় আবূ সুফিয়ানের কাছে পৌঁছে। তখন আবূ সুফিয়ান ইসলামের চরম দুশমন। তবে তিনি এ বিয়েকে অপছন্দ করেননি। এ বিয়ে সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন- 'এটা এমন সম্ভ্রান্ত কুফু, যা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।'[২৮২]

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) অত্যন্ত নেককার মহিলা ছিলেন। ইসলামের সূচনালগ্নেই তিনি স্বীয় মেধা ও বুদ্ধি দ্বারা ঈমান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যের জন্য তিনি পিতা-মাতাসহ সকল আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। যে স্বামীকে অবলম্বন করে সবকিছু ছাড়লেন, সে স্বামী তাঁকে ছেড়ে গেল। কিন্তু তিনি সত্য হতে সামান্যও বিচ্যুত হলেন না, অথচ বিত্ত-বৈভব ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দিক থেকে কুরাইশদের মধ্যে তাঁর পরিবার প্রসিদ্ধ ছিল।

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.)-এর অন্তরে ছিল রাসূল (স.)-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তাঁর পিতা কুরাইশ নেতা আবূ সুফিয়ান একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদীনা এলেন। যখন তিনি স্বীয় কন্যার গৃহে প্রবেশ করে রাসূল (স.)-এর বিছানায় বসতে ছিলেন, তখন তিনি তা গুটিয়ে ফেলেন। আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত মনোকষ্ট

---

[২৮০] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪২৭
[২৮১] প্রাগুক্ত
[২৮২] *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৯

Dhaka University Institutional Repository

পেলেন এবং বললেন- 'তুমি এই বিছানায় স্বীয় পিতাকেও বসা পছন্দ করো না?' উম্মু হাবীবা (রা.) পিতার মুখের উপর বলে দিলেন- 'আপনি মুশরিক, অপবিত্র। আমি চাই না আপনি আল্লাহর রাসূলের বিছানায় বসে অপবিত্র করুন।' আবূ সুফিয়ান একথা শুনে ক্ষোভ চেপে শুধু এতটুকু বললেন- 'তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশি ক্ষেপে গেছো।'[২৮৩]

রাসূল (স.)-এর নির্দেশের উপর তিনি নিজে যেমন আমল করেছেন। তেমনি অন্যদেরকেও আমল করার ব্যাপারে তাকীদ করতেন। একবার রাসূল (স.) বললেন–'যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ১২ রাকাআত নফল নামায পড়বে। জান্নাতে তাঁর জন্য ঘর তৈরি করা হবে।'

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) একথা শুনে এরপর সারা জীবন ১২ রাকাআত নফল নামায প্রতিদিন অত্যন্ত নিয়ম মাফিক পড়তেন।[২৮৪]

একবার তাঁর ভাগ্নে আবূ সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আল-মুগীরা ছাতু খেয়ে শুধু কুলি করলেন। উম্মু হাবীবা (রা.) তাঁকে বললেন- তোমার ওযু করা উচিত। কেননা রাসূল (স.) বলেছেন- 'আগুনে পাকানো দ্রব্য খেলে ওযু করতে হবে।'[২৮৫]

যখন তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান ইন্তিকাল করেন, তখন তিনদিন পর তিনি সুগন্ধি চেয়ে নিয়ে কপালে মাখলেন এবং বললেন- 'রাসূল (স.)-এর নির্দেশ হলো আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য তিন দিনের বেশি শোক পালন করা জায়েয নয়। শুধুমাত্র সে স্বামীর ইন্তিকালে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে।'[২৮৬]

---

[২৮৩] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১০০
[২৮৪] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৭
[২৮৫] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩২৬
[২৮৬] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) রাসূল (স.) ও হযরত যায়নাব বিন্ত জাহাশ (রা.) থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং তা বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (স.) থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে ২টি ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে এবং ২টি ইমাম মুসলিম (র.) এককভাবে বর্ণনা করেছেন।[২৮৭] তাঁর থেকে যে সকল রাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে– হাবীবা বিন্ত উবাইদুল্লাহ (কন্যা), হযরত আমীরে মু'আবিয়া ও উতবা (তার ভাই), আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা (ভাতিজা), আবূ সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ আস-সাকাফী, সালিম ইব্ন শাওয়াল। ইব্ন জাররাহ, সাফিয়া বিন্ত শায়বা। যায়নাব বিন্ত উম্মু সালামা, উরওয়া ইব্ন যুবাইর, শাহর ইব্ন শাওশাব প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২৮৮]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা.) ৪৪ মতান্তরে ৪২ হিজরীতে ৭৩ বছর বয়সে আমীর মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা.)-এর শাসনামলে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। ওফাতের পূর্বে তিনি হযরত আয়িশা (রা.) এবং হযরত উম্মু সালামা (রা.)কে ডাকলেন এবং বললেন- 'আমার ও আপনাদের মধ্যে তেমন সম্পর্কই ছিলো। যেমন সতীনদের পরস্পরের থাকে। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।' হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন- 'আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন।'[২৮৯] মারওয়ান তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁর ভাই ও বোনের ছেলেরা কবরে নেমে তাঁকে দাফন করেন।[২৯০]

---

[২৮৭] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৯

[২৮৮] প্রাগুক্ত

[২৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

[২৯০] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মায়মুনা বিন্‌ত হারিস (রা.)

প্রথমত নাম ছিল বাররা। রাসূল (স.)-এর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর তা পরিবর্তন করে মায়মুনা রাখা হয়। তাঁর বংশধারা হলো- মায়মুনা বিন্‌ত হারিস ইব্‌ন হাযান ইব্‌ন বুযাইর ইব্‌ন হাযাম ইব্‌ন বাওযাতা ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন আমের ইব্‌ন সা'সা'হ ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন বকর ইব্‌ন হাওয়াযেন ইব্‌ন মানসুর ইব্‌ন আকরামা ইব্‌ন খাসিফা ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন আইলান ইব্‌ন মুদার। মাতার নাম- হিন্‌দ বিন্‌ত আউফ ইব্‌ন জুহাইর ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হামাতাহ ইব্‌ন জারাশ। তিনি হামির গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।[২৯১]

হযরত মায়মুনা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় মাসউদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন উমাইর সাকাফীর সঙ্গে। কোনো কারণে তিনি তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। অত:পর আবূ রুহম ইব্‌ন আবদিল উয্‌যার সাথে বিয়ে হয়। ৭ম হিজরীতে আবূ রুহমের মৃত্যু হলে তিনি রাসূল (স.)-এর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেন। তিনি নবী কারীম (স.)-এর সর্বশেষ স্ত্রী।[২৯২]

রাসূল (স.) ৭ম হিজরীতে ওমরাতুল কাযা আদায়ের জন্য মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এসময় রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) মায়মুনার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। রাসূল (স.) এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে ইহরাম অবস্থাতেই ৫০০ দিরহাম মাহরের বিনিময়ে হযরত মায়মুনা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন হয়।[২৯৩] ওমরা আদায়ের পর মদীনা ফেরার পথে মক্কা হতে ১০ মাইল দূরে 'সারাফ' নামক স্থানে রাসূল (স.) অবস্থান গ্রহণ করেন।

---

[২৯১] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

[২৯২] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৩৫

[২৯৩] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬১১

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে রাসূল (স.)-এর খাদেম হযরত আবূ রাফে (রা.) হযরত মায়মুনা (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। এখানে রাসূল (স.)-এর জন্য নির্মিত তাঁবুতে বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[২৯৪]

হযরত মায়মুনা (রা.) অত্যন্ত মুত্তাকী ও অনন্য গুণাবলী সম্পন্না ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত আয়িশা (রা.) বলেছেন– 'হযরত মায়মুনা (রা.) ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।' [২৯৫]

শরীআতের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে তিনি খুব কঠোর ছিলেন, এ ব্যাপারে কোনো ধরণের নমনীয়তা তিনি পছন্দ করতেন না। একবার তাঁর এক নিকটাত্মীয় তাঁর খিদমাতে হাযির হলো। তার মুখ দিয়ে শরাবের গন্ধ আসছিল। তিনি খুব রাগান্বিত হলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন- 'সাবধান'! ভবিষ্যতে এভাবে কোনো দিন আমার গৃহে আসবে না।'[২৯৬]

একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) মাথার চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত অবস্থায় খালা হযরত মায়মুনা (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন- বেটা, চুল ও দাড়ি অবিন্যস্ত কেন? হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) উত্তরে বললেন– 'আমার স্ত্রীর বর্তমানে মাসিক অবস্থা চলছে। সেই আমার কেশ পরিপাটি করে থাকে, কিন্তু এখন এই অবস্থায় থাকার কারণে তাকে দিয়ে এই কাজ করানো ঠিক মনে করিনি।' তখন হযরত মায়মুনা (রা.) বলেন– 'হে পুত্র! হাতও কি কখনো অপবিত্র হয়? রাসূল (স.) এই অবস্থায় আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন এবং কুরআন

---

[২৯৪] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৩৫

[২৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[২৯৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

তিলাওয়াত করতেন। সে অবস্থায় মাদুর উঠিয়ে আমরা মসজিদে রেখে আসতাম, মহিলাদের ঐ অবস্থায় স্পর্শ করায় কোনো জিনিস অপবিত্র হয়না।'[২৯৭]

হযরত মায়মুনা (রা.) অত্যন্ত কল্যাণকামী ও দানশীলা ছিলেন। এ কারণে মাঝে-মধ্যে তাঁর ঋনও গ্রহণ করতে হতো। একবার একটু বেশি ঋণ নিয়ে ফেললেন। তাই কেউ একজন বললেন- এতবড় অংক পরিশোধের কী হবে? উত্তরে তিনি বললেন– আমি রাসূল (স.)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ঋণ শোধ করা ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ নিজে তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।[২৯৮]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা.)-এর মধ্যে ছিল দাসমুক্ত করার প্রবল আগ্রহ। একবার তিনি একজন দাসীকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে স্বাধীন করে দিলেন। রাসূল (স.) জানতে পেরে বললেন– 'এতে তুমি অনেক সাওয়াব অর্জন করেছো।'[২৯৯]

রাসূল (স.)-এর ইন্তিকালের পরও হযরত মায়মুনা (রা.) দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। তাই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি রাসূল (স.) থেকে ৪৬টি মতান্তরে ৭৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ৭টি বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৫টি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত মায়মুনা (রা.) হতে বর্ণিত কিছু হাদীসের মাধ্যমে শরীআতের গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীরজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[৩০০]

---

[২৯৭] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৩১
[২৯৮] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৪০
[২৯৯] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৩২
[৩০০] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মায়মুনা (রা.) হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ, আবদুর রহমান ইব্ন সায়িব, ইয়াযীদ ইব্ন, আসাম, উবাইদুল্লাহ আল-খাওলানী, নাদবা, আতা ইব্ন ইয়াসার, সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার, ইবরাহীম ইব্ন আবদুল্লাহ, উবাইদা ইব্ন সিবাক, আলীয়া বিন্ত সাবী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০১]

হযরত মায়মুনা (রা.)-এর ওফাতের সময়কাল নিয়ে বেশ মতপার্থক্য বিদ্যমান। বিভিন্ন সূত্রে ৫১, ৬১, ৬৩ ও ৬৬ হিজরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ সীরাত বিশেষজ্ঞ ৫১ হিজরীর মতটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি যে স্থানে রাসূল (স.)-এর স্ত্রী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন ৪৫ বছর পর সেই সারাফে'ই ইন্তিকাল করেন এবং যে স্থানটিতে রাসূল (স.)-এর সাথে বাসর করেন। ঠিক সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৩০২]

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) জানাযার নামায পড়ান। যখন লাশটি খাটিয়ায় করে উঠানো হয় তখন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন- 'সাবধান! ইনি রাসূল (স.)-এর সম্মানিত স্ত্রী। সুতরাং বেশি নাড়াচাড়া করো না। আদবের সাথে নিয়ে চলো।'[৩০৩] হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন খালিদ, আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ, আবদুল্লাহ ইব্ন খাওলানী এবং ইয়াযীদ ইব্ন আসাম তাঁকে কবরে নামান।'[৩০৪]

---

[৩০১] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৯

[৩০২] *সহীহ আল-বুখারী,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬১১

[৩০৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮

[৩০৪] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াই ইব্ন আখতাব (রা.)

নাম সাফিয়্যা। তবে তাঁর আসল নাম ছিল যায়নাব। তিনি খাইবার যুদ্ধের গনীমতের মাল হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসেন এবং বন্টনের সময় রাসূল (স.)-এর ভাগে পড়েন। তখন আরবে নেতা বা বাদশাহর ভাগের গনীমতের মালকে 'সাফিয়্যা' বলা হতো। সেখান থেকে তিনিও 'সাফিয়্যা' নামে পরিচিতি পান।[৩০৫] তাঁর বংশধারা হলো– সাফিয়্যা বিন্ত হুয়াঈ ইব্ন আখতাব ইব্ন সাঈদ ইব্ন আমের ইব্ন উবাইদ ইব্ন খায্‌রাজ ইব্ন আবি হাবীব ইব্ন নুযাইর ইব্ন নাহহাম ইব্ন মাইখুম। হযরত সাফিয়্যা (রা.) হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর ছিলেন।[৩০৬] তাঁর মাতা বাররা বিন্ত সামাওয়াল ইহুদী গোত্র বানু কুরাইযার সন্তান।[৩০৭]

হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর পিতা ও নানা উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের অতি সম্মানীয় সরদার ছিলেন। গোটা ইহুদী সম্প্রদায় তাঁদেরকে বেশি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারি বলে মনে করতো। তাঁর পিতা হুয়াঈ ইব্ন আখতাবকে সীমাহীন সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। তাঁর নানা সামাওয়াল গোটা আরব উপদ্বীপে বীরত্ব ও সাহসিকতার খ্যাতি ছিল।

১৪ বছর বয়সে হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর বিয়ে বানু কুরাইযার এক প্রখ্যাত অশ্বারোহী সালাম ইব্ন মাসকামুল কারাযীর সঙ্গে সম্পন্ন হয়। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ কবি ও নেতা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক টেকেনি। সালাম ইব্ন মাসকাম তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর হিযাযের বিখ্যাত সওদাগর ও খাইবারের অন্যতম নেতা আর রাফে'-

---

[৩০৫] *সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত*, সাঈদ আনসারী, মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ভারত, ১৩৪১ হিজরী, পৃ. ৮১

[৩০৬] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

[৩০৭] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

এর ভাতিজা কিনানা ইব্ন আবিল হাকীকের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। তাঁর ছিল যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি। তিনি খাইবারের প্রসিদ্ধ আল-কামূস দুর্গের নেতা ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।[৩০৮]

৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এক প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে খাইবার যখন মুসলমানদের দখলে আসে এবং আল-কামূস দূর্গের পতন ঘটে, তখন দুর্গের মধ্যেই হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর স্বামী কিনানা ইব্ন আবিল হাকীক মারা যান এবং হযরত সাফিয়্যা (রা.) সহ পরিবারের অন্যসব সদস্য মুসলমানদের হাতে বন্দি হন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন কিনানার নববধূ।[৩০৯]

গনীমতের মাল বন্টনের সময় হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা.) হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে নিজের জন্য পছন্দ করলেন। কেননা তিনি যুদ্ধ বন্দিদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তখন সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সাফিয়্যা বানু নাযীর ও বানু কুরাইযার নেত্রী। বংশীয় মর্যাদায় অনেক উঁচুতে আসীন। সে আপনারই উপযুক্ত।' রাসূল (স.) এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। দাহইয়াতুল কালবী (রা.)কে অন্য দাসী দিয়ে হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে মুক্ত করে দিলেন এবং তাঁকে নিজের গৃহে ফিরে যাওয়া কিংবা রাসূল (স.)কে বিয়ে করার স্বাধীনতা দিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) রাসূল (স.)কে বিয়ে করাই পছন্দ করলেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই রাসূল (স.) তাঁকে বিয়ে করলেন।[৩১০]

রাসূল (স.) খাইবার অভিযান সমাপ্ত করে মদীনায় ফেরার পথে 'সাহবা' নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে বাসর হয় এবং ওলীমার ব্যবস্থা করা হয়।[৩১১]

---

[৩০৮] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩১

[৩০৯] *আসাহুস সিয়ার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

[৩১০] *সহীহ মুসলিম*, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৬

[৩১১] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৬

Dhaka University Institutional Repository

এই 'সাহবা'তে রাসূল (স.) তিনরাত কাটান। অত:পর মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। সাহবা থেকে রওয়ানার সময় রাসূল (স.) তাঁকে নিজের উটের উপর চড়ালেন এবং নিজের ওবা দিয়ে তাঁর পর্দার ব্যবস্থা করলেন। তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৭ বছর। এই বিয়ের পর ইহুদীরা আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি।[৩১২]

মদীনা পৌঁছে রাসূল (স.) হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হারিস ইব্ন নু'মানের গৃহে উঠালেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর অত্যন্ত প্রিয় একজন সাহাবী। হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে থাকার জন্য তিনি সানন্দে ঘর ছেড়ে দেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) এর রুপ ও সৌন্দর্যের সুখ্যাতি শুনে আনসার মহিলাদের সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যয়নাব বিন্ত জাহাশ, হযরত হাফসা, হযরত আয়িশা ও হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) তাঁকে দেখতে এলেন। যখন তারা তাকে দেখে ফিরে যেতে লাগলেন তখন রাসূল (স.) তাঁদের পেছনে পেছনে চললেন এবং হযরত আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন– 'আয়িশা' তুমি তাকে কেমন দেখলে?" উত্তরে হযরত আয়িশা (রা.) বললেন– 'সে তো একজন ইহুদী নারী'। তখন রাসূল (স.) বললেন– একথা বলো না সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একজন উত্তম মুসলমান হয়েছে। [৩১৩]

হযরত সাফিয়্যা (রা.) স্বভাবগত ভাবেই প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। যে ঘরে তিনি বসবাস করতেন জীবদ্দশায় তা দান করে গিয়েছেন। তাছাড়া তিনি যখন উম্মুল মু'মিনীন হিসেবে মদীনায় আসেন তখন হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে দেখতে এলেন এসময় তিনি নিজের কানের সোনার দু'টি দুল খুলে হযরত ফাতিমা (রা.)কে দিয়ে দেন এবং তাঁর সাথে আগত অন্যান্য মহিলাকেও কোন না কোনো গহনা প্রদান করেন।[৩১৪]

---

[৩১২] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, ৭৪

[৩১৩] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১২৫-১২৬

[৩১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর প্রতি হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর ছিল সীমাহীন ভালোবাসা। রাসূল (স.) হযরত আয়িশা (রা.)-এর গৃহে অন্তিম রোগ শয্যায় থাকাকালে সকল সম্মানিত স্ত্রী রাসূল (স.)-এর সেবা শুশ্রুষার জন্য উপস্থিত হলো। হযরত সাফিয়্যা (রা.) রাসূল (স.)কে এ অশ্বস্তিপূর্ণ অবস্থায় দেখে বললেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সব কষ্ট যদি আমি পেতাম।' তাঁর এমন কথা শুনে অন্য বিবিগণ তার দিকে এমনভাবে তাকালেন যে, তাঁর কথায় তাঁরা সন্দেহ করছেন। এসময় রাসূল (স.) বললেন– 'আল্লাহর কসম! সে সত্য কথা বলেছে।'[৩১৫] রাসূল (স.)ও হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং সর্বদা তাঁকে খুশি রাখার চেষ্টা করতেন। রাসূল (স.) হযরত সাফিয়্যা (রা.)সহ অন্যান্য স্ত্রীগণকে সঙ্গে নিয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। পথিমধ্যে হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ে। এতে তিনি দুশ্চিন্তা গ্রস্থ হয়ে পড়েন। রাসূল (স.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করেন এবং হযরত যায়নব বিন্ত জাহাশ (রা.)কে বলেন– 'যায়নাব! তুমি তাঁকে একটি উট দিয়ে দাও।' হযরত যায়নাব (রা.) অত্যন্ত দানশীল মহিলা ছিলেন। তবুও অযাচিতভাবে বলে ফেললেন– 'আমি কি এই ইহুদী মহিলাকে নিজের উট দিয়ে দিব?' তাঁর এই প্রত্যুত্তরে রাসূল (স.) অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি ২/৩ মাস পর্যন্ত হযরত যায়নাব (রা.)-এর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেননি। অবশেষে হযরত আয়িশা (রা.)-এর মধ্যস্থতায় অতি কষ্টে রাসূল (স.)-এর অসন্তুষ্টি দূর করান।[৩১৬]

ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে কেউ ইহুদী বলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলে তিনি ভীষণ কষ্ট পেতেন। তবু তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতেন এবং কাউকে কোন দিন কঠিন প্রত্যুত্তর দেননি। একবার রাসূল (স.) তাঁর ঘরে গিয়ে দেখেন হযরত সাফিয়্যা (রা.) কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– আয়িশা (রা.) ও যায়নব বলে থাকেন, আমরা সকল স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম । কেননা আমরা রাসূল (স.)-এর স্ত্রী হওয়া ছাড়া তার আত্মীয়ও। কিন্তু তুমি ইহুদী কন্যা তখন রাসূল (স.) তাকে খুশি করার জন্য বলেন– 'তুমি তাদেরকে এ

---

[৩১৫] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৫

[৩১৬] *উসুদুল গাবা,* প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৯২

Dhaka University Institutional Repository

কথা কেন বললে না যে, আমার বাবা হযরত হারুন (আ.), আমার চাচা মূসা (আ.) এবং আমার স্বামী মুহাম্মদ (স.)। এ কারণে তোমরা আমার চেয়ে ভাল হতে পার কিভাবে"।[৩১৭]

দশম হিজরীতে রাসূল (স.)-এর সাথে হাজ্জ আদায় করেন। এটা ছিল রাসূল (স.)-এর বিদায় হাজ্জ। হযরত ওমার ফারুক (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর এক দাসী খলীফার কাছে অভিযোগ করলো যে, এখনও সাফিয়্যা (রা.)-এর মধ্যে ইহুদী ভাব বিদ্যমান। কেননা এখনও তিনি শনিবারকে ভাল মনে করেন এবং ইহুদীদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। দাসীর কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য খলীফা হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে সাফিয়্যা (রা.) বলেন– যখন থেকে আল্লাহ আমাকে শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার প্রদান করেছেন, তখন থেকে শনিবারকে ভালোবাসার প্রযোজনীয়তা হারিয়ে গেছে। আর ইহুদীদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো, সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। আমাকে আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। খলীফা ওমার ফারুক (রা.) উম্মুল মু'মিনীনের স্পষ্ট বক্তব্যে খুব খুশি হন। এর পর তিনি দাসীকে ডেকে জানতে চান, এ অভিযোগ করতে কে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করছে? সে বললো– 'শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে।' উম্মু মু'মিনীন চুপ হয়ে যান এবং তাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন।[৩১৮]

৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীরা তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)কে মদীনায় তার গৃহে অবরুদ্ধ করে রাখে। সে সময় হযরত সাফিয়্যা (রা.) খলীফার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি হাসান (রা.)কে খলীফার গৃহের সাথে যোগযোগের দায়িত্ব দেন। তিনি হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর গৃহ থেকে খাবার ও পানি খলীফার গৃহে পৌঁছে দেন।[৩১৯]

---

[৩১৭] *আল-মুসতাদরিক*, মুহাম্মদ আল্-হাকীম নিশাপুরী, হায়দরাবাদ, ১৩৩৪ হি., ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯

[৩১৮] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৩

[৩১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যন্যা উম্মুল মু'মিনীনদের ন্যায় হযরত সাফিয়্যা (রা.)ও ছিলেন ইল্‌ম ও মারিফাতের কেন্দ্র। কুফার মহিলারা প্রায়ই তার নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞেস করতো এবং তারা উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হতো। হাদীস ও ফিক্‌হসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল।

হযরত সাফিয়্যা (রা.) থেকে মোট ১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (রা.) সম্মিলিতভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– ইমাম যাইনুল আবিদীন, ইসহাক ইব্‌ন আবদিল্লাহ, মুসলিম ইব্‌ন সাফও য়ান, কিনানা, ইয়াযীদ ইব্‌ন মু'আত্তাব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২০]

হযরত সাফিয়্যা (রা.) ৫০ হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় ইনতিকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। হযরত সাঈদ ইব্‌ন আস (রা.) মতান্তরে আমীরে মুআবিয়া (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। মদীনায় জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়। [৩২১]

---

[৩২০] *সিয়ারু আ'লাম আন্‌-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৮

[৩২১] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নবী তনয়াগণের ভূমিকা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অবশিষ্ট নারী সাহাবীগণের ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ অধ্যায়

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা

নারী সাহাবীগণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানভাবে এগিয়ে গেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা আলোকপাত করেছি। এ অধ্যায়ে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নবী তনয়াগণের ভূমিকা

এ পরিচ্ছেদে রাসূল (স.)-এর চার কন্যার পরিচিতি এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের ভূমিকা তুলে ধরা হল।

হযরত যায়নাব বিন্ত রাসূলিল্লাহ (স.)

নাম যায়নাব। তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর সম্মানিতা জননী ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)। হযরত যায়নাব (রা.) রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম আয-যাহাবী (র.) বলেন– "হযরত যায়নাব (রা.) হলেন রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কন্যা এবং তাঁর হিজরাতকারিণী সায়্যিদাত বোনদের মধ্যে সবার বড়।"[৩২২]

---

[৩২২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত যায়নাব (রা.)-এর বিয়ে শৈশবকালে রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে খালাতো ভাই আবুল আস ইব্ন আর-রাবী ইব্ন আবদিল উয্যা (রা.)-এর সঙ্গে হয়েছিল। আবুল আস ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর আপন ছোট বোন হালা বিন্ত খুওয়াইলিদের পুত্র।[৩২৩] বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা.) মেয়েকে ইয়ামানী আকীকের একটি হার উপহার হিসেবে প্রদান করেন।[৩২৪]

রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে মায়ের সঙ্গে হযরত যায়নাব (রা.) ঈমান গ্রহণ করেন। রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর কুরাইশ কাফিররা মুসলমানদের উপর সীমাহীন নির্যাতন করতে থাকে। রাসূল (স.)-এর দু'কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) ও উম্মু কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল আবূ লাহাবের দু'পুত্রের সঙ্গে। তারা উভয়েই পিতার কথামতো দু'জনকেই তালাক প্রদান করে। কাফিররা আবুল আসকেও হযরত যায়নাব (রা.)কে তালাক প্রদানের জন্য প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে হযরত যায়নাব (রা.)-এর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স.) আবুল আসের এই কর্মকান্ডের প্রায়ই প্রশংসা করতেন।[৩২৫]

আবুল আস স্ত্রী যায়নাব (রা.)কে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু তিনি পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে প্রিয়তমা স্ত্রীর নতুন দ্বীন ইসলাম কবুল করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। এদিকে রাসূল (স.) হিজরাত করে মদীনায় গমন করেন। হযরত যায়নাব (রা.) তখন স্বামীর সাথে শ্বশুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ২য় হিজরীর রমযান মাসে মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে আবুল আস অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুরাইশদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। বদরে কুরাইশরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। আবু জাহ্লসহ তাদের বেশ কিছু নেতা নিহত হয় এবং বহু লোক মুসলমানদের হাতে বন্দি

---

[৩২৩] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩১

[৩২৪] প্রাগুক্ত,

[৩২৫] *সুনানে আবূ দাউদ*, ১ম খন্ড, পৃ. ২২২

Dhaka University Institutional Repository

হয়। বন্দিদের মধ্যে হযরত যায়নাব (রা.)-এর স্বামী আবুল আসও ছিলেন। বন্দিদের ব্যাপারে মুসলমানদের সিদ্ধান্ত হলো, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে। কুরাইশরা যখন এ সংবাদ পেল, তখন বন্দিদের আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের মুক্তির জন্য রাসূল (স.)-এর কাছে মুক্তিপণ প্রেরণ করতে লাগলো। হযরত যায়নাব (রা.)ও মক্কা থেকে নিজের দেবর আমর ইব্ন রাবীর হাতে ইয়ামানী আকীক পাথরের একটি হার স্বামীর মুক্তির জন্য প্রেরণ করেন। এ হারটি হযরত যায়নাব (রা.)কে তাঁর জননী হযরত খাদীজা (রা.) বিয়ের সময় উপহার দিয়েছিলেন। রাসূল (স.) হারটি দেখেই হযরত খাদীজা (রা.)-এর কথা স্মরণ হলো এবং তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.) সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন– 'যায়নাব (রা.) তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য এই হারটি পাঠিয়েছে। যদি তোমরা ভালো মনে করো তাহলে তাঁর স্বামীকে মুক্তি দিতে পারো এবং হারটিও তাঁকে ফেরত দিতে পারো। এটা তাঁর মায়ের স্মৃতি।' সাহাবীগণ বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাই করবো।' রাসূল (স.) বললেন– 'আবুল আসের মুক্তিপণ হলো, সে মক্কা গিয়ে হযরত যায়নাব (রা.)কে দ্রুত মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।' সাহাবীগণ এ শর্তে আবুল আসকে মুক্তি দিলেন এবং মুক্তিপণের হারটিও ফেরত দিলেন।[৩২৬]

রাসূল (স.) হযরত যায়নাব (রা.)কে নিয়ে আসার জন্য আবুল আসের সঙ্গে হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)কে পাঠান এবং নির্দেশ দিলেন, সে যেন 'বাতান' কিংবা 'জাজ' নামক স্থানে অবস্থান করে অপেক্ষা করতে থাকে এবং যায়নাব (রা.) মক্কা থেকে সেখানে পৌঁছলে তাঁকে যেন মদীনায় নিয়ে আসে। আবুল আস মক্কায় পৌঁছে হযরত যায়নাব (রা.)কে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করে এবং নিজের ছোট ভাই কিনানা ইব্ন রাবীর সঙ্গে হযরত যায়নাব (রা.)কে মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা করে দিলেন।

---

[৩২৬] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশরা যখন এ সংবাদ পেল তখন তারা হযরত যায়নাব (রা.)-এর পিছু নিল এবং 'জিত্ওয়া' নামক উপত্যকায় গিয়ে তাদেরকে ধরে ফেললো। হযরত যায়নাব (রা.) উটের উপর সাওয়ার ছিলেন। কাফিরদের মধ্যকার হাব্বার ইব্ন আস্ওয়াদ হযরত যায়নাব (রা.)কে বর্শা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এই আঘাতে তাঁর গর্ভের সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় কিনানা ইব্ন রাবী অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। নিজের তীর বের করে তা ধনুতে চড়িয়ে হুংকার দিয়ে বললেন– 'তোমাদের কেউ সামনে অগ্রসর হলে তার কলিজা হবে আমার তীরের লক্ষ্যস্থল।' কিনানা ছিল একজন দক্ষ তীরন্দাজ। তার নিক্ষিপ্ত কোনো তীর সাধারণত লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো না। তাঁর এই হুংকারে কাফিররা ভয় পেয়ে গেল। আবূ সুফিয়ানও তাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বললেন– 'ভাতিজা! তুমি যে তীরটি আমাদের দিকে তাক করেছো তা একটু সম্বরণ করো। আমরা তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।' কিনানা তীরটি নামিয়ে নিয়ে বললো- 'কি বলতে চান, বলে ফেলুন।' তখন আবূ সুফিয়ান তার কানে কানে বললেন– 'তোমার কাজটি ঠিক হয়নি। তুমি প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে মানুষের সামনে দিয়ে যায়নাবকে নিয়ে বের হয়েছো, আর আমরা তা বসে বসে দেখছি। মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে আমরা যেভাবে অপমানিত হয়েছি তা গোটা আরববাসী জানে। যদি তুমি তাঁর কন্যাকে এইভাবে প্রকাশ্যে আমাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমাদেরকে কাপুরুষ ভাববে। তার চেয়ে বরং এটাই উত্তম যে, তুমি এখন যায়নাবকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা ফিরে যাও। কিছুদিন সে স্বামীর গৃহে অবস্থান করুক। অন্য কোনো সময় চুপিসারে তাঁকে মদীনা নিয়ে যাবে।'

কিনানা আবূ সুফিয়ানের এ পরামর্শ মেনে নিলেন এবং হযরত যায়নাব (রা.)কে নিয়ে মক্কা ফিরে এলেন। কিছুদিন পর তিনি রাতের অন্ধকারে হযরত যায়নাব (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে 'বাতান' কিংবা জাজে পৌঁছলেন এবং তাঁকে হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)-এর হাতে তুলে দিলেন। হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) হযরত যায়নাব (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন।[৩২৭]

---

[৩২৭] *তাবারী*, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আস হযরত যায়নাব (রা.)কে খুবই ভালোবাসতেন। এ কারণে হযরত যায়নাব (রা.) মদীনায় চলে যাওয়ার পর আবুল আস খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন। একবার সিরিয়া সফরে থাকাকালীন তিনি হযরত যায়নাব (রা.)-এর স্মরণে দরদভরা কণ্ঠে নিম্নের পংক্তি আওড়াতে থাকেন– "আমি যখন ইরিম অতিক্রম করছিলাম তখন যায়নাবের কথা মনে হলো এবং বললাম, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি হারামে বসবাস করছে তাকে তুমি চির সবুজ রেখো। আমীন মুহাম্মদ (স.)-এর কন্যাকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন এবং প্রত্যেক স্বামীই সে কথারই প্রশংসা করে যা সে ভালোভাবে জানে।"[৩২৮]

হযরত যায়নাব (রা.) মদীনায় চলে যাবার পর আবুল আস মক্কায় বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন অর্থ-বিত্ত, আমানতদারী ও ব্যবসায়ী হিসেবে খুবই প্রসিদ্ধ। ৬ষ্ঠ হিজরীতে জমাদিউল আউয়াল মাসে তিনি একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া গমন করেন। ফেরার পথে কাফিলাটি যখন মদীনার কাছাকাছি স্থানে তখন যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম মুজাহিদগণ কাফিলাকে হামলা করে এবং কাফিলার সকল লোককে বন্দি করে। কিন্তু আবুল আস পালিয়ে মদীনায় চলে যান। যার কারণে তাকে বন্দি করা সম্ভব হয়নি। তিনি মদীনায় গিয়ে সোজা হযরত যায়নাব (রা.)-এর আশ্রয়ে চলে যান।[৩২৯] হযরত যায়নাব (রা.) রাসূল (স.)-এর কাছে আবুল আসের কাফিলার লোকদের অর্থ সম্পদসহ মুক্তিদানের জন্য আবেদন জানালেন। রাসূল (স.) সাহাবীদেরকে বললেন– 'আমার ও আবুল আসের মধ্যে যে সম্পর্ক তাতো তোমরা জান। তোমরা যদি তার প্রতি সদয় হয়ে তার মালামাল ফিরিয়ে দাও তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো। আর তোমরা রাজী না হলেও আমার কোনো আপত্তি নেই।' সাহাবীগণ সব সময় রাসূল (স.)-এর সন্তুষ্টিই কামনা করতেন। তাঁরা বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাঁর সবকিছুই ফেরত দিচ্ছি।'[৩৩০]

---

[৩২৮] *আনসাবুল আশ্‌রাফ,* প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৯৮

[৩২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৯

[৩৩০] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আবুল আস তার কাফিলা ছাড়িয়ে নিয়ে মক্কায় পৌঁছলেন এবং প্রত্যেকের আমানত বুঝিয়ে দিয়ে বললেন– 'হে কুরাইশবাসী! আমার কাছে কারো কোনো পাওনা আছে কি?' তারা বললো– 'মোটেই না। আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন। তুমি একজন প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী মানুষ।'

তখন আবুল আস বললেন– 'আমি তোমাদের হক পূর্ণভাবে আদায় করেছি। শুনে রাখ এখন আমি মুসলমান হলাম। মদীনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম। কিন্তু তা দেইনি এ কারণে যে, তোমরা আমাকে খিয়ানতকারী মনে করবে।' একথা বলে তিনি কালিমা শাহাদাত পাঠ করেন এবং মক্কা থেকে হিজরাত করে মদীনায় রাসূল (স.)-এর নিকট গমন করেন। এটা ছিল ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসের ঘটনা।[৩৩১] রাসূল (স.) আবুল আস ও যায়নাব (রা.)-এর বিয়ের প্রথম আক্দের ভিত্তিতে স্ত্রী যায়নাব (রা.)কে স্বামী আবুল আসের গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[৩৩২]

হযরত যায়নাব (রা.) দামী জামা-কাপড় পড়তে পছন্দ করতেন। হযরত আনাস (রা.) একবার তাঁকে একটি রেশমী চাদর গায়ে দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান। চাদরটির পাড় ছিল হলুদ বর্ণের।[৩৩৩]

হযরত যায়নাব (রা.) আবুল আস (রা.)-এর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার পর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। ৮ম হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৩৩৪] যখন তিনি তাঁর পিতা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হন, তখন পথিমধ্যে তাঁকে আক্রমণ করে উট থেকে ফেলে দেয়া হয়। এতে তাঁর গর্ভপাত হয়ে রক্ত ঝরে এবং দীর্ঘদিন তিনি রোগে ভুগতে থাকেন। এ গর্ভপাতের কষ্টই তাঁর ইন্তিকালের কারণ ছিল। এ

---

[৩৩১] প্রাগুক্ত

[৩৩২] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৯

[৩৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০

[৩৩৪] *আত্-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) রাসূল (স.) থেকে বর্ণনা করেন– 'সে ছিল আমার সবচেয়ে ভালো মেয়ে। আমাকে ভালোবাসার কারণেই তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে।'[৩৩৫]

হযরত উম্মু আইমান (রা.), হযরত সাওদা (রা.), হযরত উম্মু সালামা ও হযরত উম্মু আতিয়া (রা.) মাইয়্যেতকে গোসল দিয়েছিলেন। গোসল সমাপ্তির পর রাসূল (স.) কে সংবাদ দেয়া হয়। তিনি স্বীয় তহবন্দ দান করেন এবং তা কাফনের মধ্যে পরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন।[৩৩৬] রাসূল (স.) জানাযার নামায পড়ান এবং নিজে করবে নেমে নিজ হাতে লাশকে কবরের মধ্যে রাখেন।

হযরত যায়নাব (রা.) এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গিয়েছিলেন। পুত্রের নাম আলী (রা.) এবং কন্যার নাম উমামাহ। পুত্র আলী বালেগ হওয়ার পূর্বে পিতা আবুল আস (রা.)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন। কন্যা উমামাহ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন।[৩৩৭]

---

[৩৩৫] *হায়াতুস সাহাবা,* ইউসুফ আল-কান্ধালুবী, দারুল কালাম, দামিস্ক, ১৯৮৩, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭২
[৩৩৬] *মহিলা সাহাবী,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
[৩৩৭] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত রুকাইয়্যা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ্ (স.)

নাম রুকাইয়া। তিনি রাসূল (স.)-এর দ্বিতীয় কন্যা ছিলেন। মা ছিলেন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)। রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় রাসূল (স.)-এর বয়স ছিল ৩৩ বছর। হযরত রুকাইয়্যা (রা.) হযরত যায়নাব (রা.) থেকে তিন বছরের ছোট ছিলেন।[৩৩৮]

রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সাথে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়। রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত লাভের পর কুরাইশদের সাথে যখন বিরোধ চরমে তখন স্বামী উতবা পিতা আবূ লাহাবের নির্দেশে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)কে তালাক প্রদান করে।[৩৩৯] অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, যখন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীলের নিন্দায় সূরা লাহাব নাযিল হয় তখন আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল ক্ষুব্ধ হয়ে ছেলে উতবাকে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর তালাকের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেন। পিতা-মাতার অনুগত সন্তান উতবা তখন হযরত রুকাইয়্যা (রা.)কে তালাক দিয়ে দেয়। অথচ তখনও বিয়ের রুখসতের অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়নি।[৩৪০] কিছুদিন পর হযরত উসমান ইব্‌ন আফকান (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র যুবক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কিছুদিন পরেই হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর বিয়ে সম্পন্ন হয়।[৩৪১]

হযরত রুকাইয়্যা (রা.) তাঁর মা হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এবং বড় বোন হযরত যায়নাব (রা.)-এর সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৩৪২] কুরাইশরা যখন মুসলমানদের

---

[৩৩৮] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০
[৩৩৯] *সীরাতু ইব্‌ন হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৫২
[৩৪০] *আত্-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৬
[৩৪১] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত
[৩৪২] *সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫১

Dhaka University Institutional Repository

উপর চরম অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে তখন রাসূল (স.) তাঁদেরকে হাবশায় হিজরাতের অনুমতি প্রদান করেন। রাসূল (স.)-এর অনুমতি পেয়ে নবুওয়্যাতের ৫ম বছরে হযরত রুকাইয়্যা (রা.) স্বামী হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। রাসূল (স.) যখন তাঁদের হিজরাতের কথা জানতে পারেন তখন তিনি বললেন– 'নিশ্চয় তাঁরা দুইজন হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত লূত (আ.)-এর পর প্রথম হিজরাতকারী।'[৩৪৩]

কিছুদিন হাবশায় অবস্থানের পর তাঁরা আবার মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু তখন কুরাইশদের নির্যাতন পূর্বের চেয়ে আরো বেড়ে গিয়েছিল। তাই তাঁরা পুনরায় হাবশায় হিজরাত করলেন। দীর্ঘদিন হাবশায় অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে আসেন এবং কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করে রাসূল (স.)-এর নির্দেশে চিরদিনের জন্য মদীনায় হিজরাত করেন।[৩৪৪] সেখানে হযরত আউস ইব্ন সাবিত (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন।

হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যে পারস্পরিক গভীর ভালোবাসা ছিল। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে তাঁরা কখনও বিচ্ছিন্ন হননি। সকল প্রতিকূল অবস্থা তাঁরা একসাথে মুকাবিলা করেছেন। তাঁদের মধুর সম্পর্কের কারণে লোকেরা উদাহরণ হিসেবে এই প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহার করতো– "মানুষের দেখা দম্পত্তিদের মধ্যে রুকাইয়্যা ও তাঁর স্বামী হযরত উসমান (রা.) হলো সর্বোত্তম।"[৩৪৫]

হযরত রুকাইয়্যা (রা.) ছিলেন খুবই রূপ লাবণ্যের অধিকারী। হাবশায় অবস্থানকালে সেখানকার একদল বখাটে লোক তাঁর সৌন্দর্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তারা তাঁকে ভীষণ বিরক্ত করতে থাকে। তিনি তাদের জন্য বদ-দু'আ করেন এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।[৩৪৬]

---

[৩৪৩] *আনসাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৯
[৩৪৪] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৬
[৩৪৫] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩০৫
[৩৪৬] *সাহাবিয়াত*, নিয়াজ ফতেহপুরী, নাফীস একাডেমি, করাচি, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় পৌঁছার পর দ্বিতীয় হিজরীতে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর শরীরে বসন্ত বের হয়। এসময় রাসূল (স.)সহ মুসলমানরা বদর যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। রাসূল (স.) হযরত উসমান (রা.)কে তাঁর রুগ্ন স্ত্রীর সেবা-শুশ্রুষা করার জন্য মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। এজন্য হযরত উসমান (রা.) হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর নিকটে মদীনায়ই রয়ে গেলেন। রাসূল (স.) বদরেই যুদ্ধাবস্থায় ছিলেন, এ সময়ে হযরত রুকাইয়্যা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২১ বছর। হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর লাশ কবরে দিয়ে মাটি নিক্ষেপ করা অবস্থায় হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। রাসূল (স.) হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর ওফাতের সংবাদ পেয়ে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন এবং চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।[৩৪৭]

দ্বিতীয়বার হাবশায় অবস্থানকালে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের নামানুসারে হযরত উসমান (রা.)-এর উপনাম হয় আবূ আবদিল্লাহ। ৬ বছর বয়সে একটি মোরগ আবদুল্লাহর চোখে ঠোকর মারে এবং এতে তাঁর সমগ্র মুখমন্ডল ফুলে যায়। এই দূর্ঘটনায় ৪র্থ হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে সে মারা যায়। রাসূল (স.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত উসমান (রা.) কবরে নেমে তাঁর দাফন কাজ সম্পন্ন করেন।[৩৪৮]

---

[৩৪৭] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[৩৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু কুলসুম বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.)

নাম উম্মু কুলসুম। তিনি রাসূল (স.)-এর তৃতীয় কন্যা ছিলেন। মাতার নাম ছিল হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)। অধিকাংশ সীরাতকার লিখেছেন যে, রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির ৬ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৩৪৯]

রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বেই আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সাথে হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এবং তার দ্বিতীয় পুত্র উতাইবার সাথে হযরত উম্মু কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল। রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর তিনি যখন মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান জানান তখন আবূ লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মু জামিল রাসূল (স.)-এর দুশমনে পরিণত হলো। কিছুদিন পর যখন আবূ লাহাব ও তাঁর স্ত্রীর নিন্দায় সূরা লাহাব নাযিল হয়, তখন তারা অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের দুই পুত্রকে লক্ষ্য করে বললো– 'তোমরা যদি মুহাম্মদ (স.)-এর কন্যাকে তালাক দিয়ে বিদায় না করো তোমাদের সাথে বসবাস হারাম।'[৩৫০] তখন উতবা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)কে এবং উতাইবা হযরত উম্মু কুলসুম (রা.)কে তালাক প্রদান করে। অবশ্য উভয় বোনের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাঁরা তখনও স্বামীর ঘর করা শুরু করেননি।

তালাকের পর হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর বিয়ে হয় হযরত উসমান (রা.)-এর সঙ্গে। বিয়ের মাত্র কয়েক বছর পর ২য় হিজরীতে রুকাইয়্যা (রা.) ইন্‌তিকাল করেন। তাঁর ইন্‌তিকালে হযরত উসমান (রা.) খুবই বিষণ্ন ও বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় রাসূল (স.) ৩য় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে স্বীয় কন্যা হযরত উম্মু কুলসুম (রা.)-এর বিয়ে সম্পন্ন করেন।[৩৫১] বিয়ের সময় রাসূল (স.) হযরত উসমান

---

[৩৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[৩৫০] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৭

[৩৫১] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

(রা.)কে বললেন– 'হযরত জিবরাঈল আমীন আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছেন যে, আমি যেন রুকাইয়্যার নির্ধারিত মাহরের ভিত্তিতে উম্মু কুলসুমকে তোমার সাথে বিয়ে দেই।'[৩৫২]

হযরত উম্মু কুলসুম (রা.) তাঁর মা হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাথেই ইসলাম কবুল করেন। রাসূল (স.) মদীনায় হিজরাতের পর তিনি পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন।[৩৫৩]

হযরত উসমান (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ের পর হযরত উম্মু কুলসুম (রা.) ৬ বছর জীবিত ছিলেন এবং ৯ম হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন। হযরত সুফিয়া বিন্ত আবদিল মুত্তালিব (রা.), হযরত উম্মু আতিয়্যা (রা.) এবং হযরত আসমা বিন্ত আমিস (রা.) রাসূল (স.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী গোসল দিলেন। কাফনের জন্য রাসূল (স.) নিজের চাদর দিলেন এবং নিজেই জানাযার নামায পড়ান। হযরত আলী (রা.), হযরত আবূ তালহা (রা.), হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) এবং হযরত ফযল ইব্ন আব্বাস (রা.) লাশ কবরে নামান। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৫৪] কন্যা উম্মু কুলসুম (রা.)-এর ওফাতে রাসূল (স.) ভীষণ কষ্ট পান। যখন লাশ কবরে নামানো হয় তখন তাঁর চক্ষু দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।[৩৫৫]

---

[৩৫২] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৬১৩
[৩৫৩] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫২
[৩৫৪] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
[৩৫৫] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২৬-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত রাসূলিল্লাহ (স.)

নাম ফাতিমা। উপাধি যাহরা, সাইয়্যিদাতুন নিসায়ি আহলিল জান্নাত, বাতুল, তাহিরা, মুতহিরা, রাজিয়া, মুরজিয়া ও যাকিয়া। উপনাম উম্মু মুহাম্মদ। তিনি রাসূল (স.)-এর চতুর্থ ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন।[৩৫৬] রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় হযরত ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। তখন মক্কার কুরাইশরা পবিত্র কাবা ঘরের সংস্কার কাজ চালাচ্ছে। হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বয়সে ৫ বছরের বড় ছিলেন।[৩৫৭]

শৈশবকাল থেকেই হযরত ফাতিমা (রা.) অত্যন্ত গম্ভীর ও নির্জন প্রিয় ছিলেন। তিনি কখনও কোনো খেলাধূলায় অংশ নেননি এবং ঘরের বাইরে পা রাখেননি। সবসময় মায়ের পাশে পাশে থাকতেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর যাবতীয় কর্মতৎপরতায় আল্লাহ প্রেমের বহি:প্রকাশ ঘটতো। হযরত খাদীজা (রা.)-এর এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-এর জন্য ভালো কাপড় ও গহনা বানালেন। বিয়েতে যাওয়ার সময় ফাতিমা (রা.) এই দামী কাপড় ও গহনা পড়তে অস্বীকার করলেন এবং সাধারণ পোশাকেই বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন।[৩৫৮]

রাসূল (স.)-এর উপর ওহী নাযিল হবার পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। আর রাসূল (স.)-এর প্রতি প্রথম পর্বে যেসব মহিলা ঈমান আনেন তাঁদের অগ্রভাগে ছিলেন তাঁর পূত:পবিত্র কন্যাগণ। সে হিসেবে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর মহিয়ষী মা হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাথে রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান আনেন।[৩৫৯]

---

[৩৫৬] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
[৩৫৭] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৯
[৩৫৮] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত
[৩৫৯] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

নবুওয়্যাতের দশম বছরে হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তিকাল করলে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর উপর বিপদের পাহাড় নেমে আসে। তখন তাঁর শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানের জন্য রাসূল (স.) হযরত সাওদা (রা.)কে বিয়ে করেন। রাসূল (স.) নিজেও সুযোগ পেলেই তাঁকে আদর ও মূল্যবান নসিহত প্রদান করতেন।[৩৬০]

ইসলাম প্রচারের কারণে মক্কার কাফিররা প্রিয় নবী (স.)কে খুব কষ্ট দিতো। কখনো মাথায় মাটি ঢেলে দিতো, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। যখন রাসূল (স.) ঘরে ফিরতেন তখন হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। কখনো পিতার বিপদে মুহ্যমান হয়ে পড়তেন। একবার রাসূল (স.) কাবা শরীফে নামায আদায় করছিলেন। সিজদারত থাকাবস্থায় নরাধম উক্‌বা ইব্‌ন আবী মুঈতের নেতৃত্বে কাফিররা উটের পঁচা নাড়ী-ভূড়ি রাসূল (স.)-এর পিঠের উপর রেখে দিল। দূর থেকে কুরাইশ নেতারা এ দৃশ্য অবলোকন করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। রাসূল (স.) সিজদা হতে উঠলেন না। সাথে সাথে এ সংবাদ বাড়িতে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কানে গেল। তিনি ছুটে এসে অত্যন্ত দরদের সাথে নিজ হাতে পিতার পিঠ থেকে ময়লা সরিয়ে ফেলেন এবং পানি এনে রাসূল (স.)-এর দেহের ময়লা পরিষ্কার করেন। তারপর সেই পাপাচারী দলটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদেরকে বললেন– 'হতভাগারা! মহান আল্লাহ তোমাদের এই অপকর্মের অবশ্যই শাস্তি দিবেন।' কয়েক বছর পর এসব পাপিষ্ঠ বদরের যুদ্ধে নিহত হয়।[৩৬১]

কুরাইশরা রাসূল (স.)-এর উপর নির্যাতন চালানোর নতুন কৌশল বেছে নিল। নবুওয়্যাতের ৭ম বছরে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদেরকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়, ফলে রাসূল (স.) ও তাঁর পরিবার বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। তিনি জ্ঞাতিগোষ্ঠিসহ মক্কার অদূরে চারদিক পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় আশ্রয় নিলেন। এ উপত্যকায় প্রবেশের জন্য একটি সংকীর্ণ গিরিপথ ছিল যেখান দিয়ে মক্কা থেকে কেউ এলে প্রবেশ করতে পারতো। সীমিত

---

[৩৬০] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৩৬১] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

খাদ্য সরবরাহের উপর নির্ভর করে সে উপত্যকায় (এ উপত্যকার নাম ছিল শিয়াবে আবী তালিব) বানূ হাশিম এবং বানু আবদিল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরসহ রাসূল (স.) দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। অবরুদ্ধ জীবন এক পর্যায়ে ভয়াবহ রূপ লাভ করে। উপত্যকায় ক্ষুধার্ত শিশু ও নারীদের কান্নার রোল মক্কা থেকেও শোনা যেত। কুরাইশরা কাউকে মুসলমানদের কাছে খাবার পৌঁছাতে বা যোগাযোগ করতে দিতো না। এই অবরুদ্ধদের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা.)ও ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো ১২ বছর। এই অবরোধ তাঁর স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এখানে অনাহারে থেকে যে অপুষ্টির শিকার হন তা তিনি আমৃত্যু বহন করে চলেন। কুরাইশদের এ বয়কট প্রায় তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল।[৩৬২]

মক্কায় কাফির মুশরিকদের যুল্‌ম সীমা অতিক্রম করল, তখন মহান আল্লাহ রাসূল (স.)কে মদীনায় হিজরাতের নির্দেশ দেন। ৬২২ খৃষ্টাব্দে রাসূল (স.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরাত করলেন। মদীনা পৌঁছার কিছুদিন পর রাসূল (স.) পরিবার-পরিজনকে আনার জন্য হযরত আবূ রাফে (রা.) এবং হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.)কে মক্কা প্রেরণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রা.)সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা মদীনায় হিজরাত করেন। মদীনায় পৌঁছে রাসূল (স.)-এর স্ত্রী হযরত সাওদা (রা.) এবং কন্যাগণ রাসূল (স.)-এর নিকট নতুন ঘরে অবস্থান শুরু করেন।[৩৬৩] মদীনায় হিজরাতের সময়ে হযরত ফাতিমা (রা.) প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছিলেন। এসময় হযরত আবূ বকর (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করলে তিনি বললেন– 'আবূ বকর! তাঁর ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করো।' হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত ওমার (রা.)-এর নিকট একথা প্রকাশ করলে হযরত ওমার (রা.) বললেন– তিনিতো আপনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অত:পর হযরত ওমার ফারুক (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। রাসূল (স.)

---

[৩৬২] *নিসা মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাত*, আহমাদ খলীল জুমু'আ, দারু ইব্‌ন কাসীর, ২০০১, পৃ, ২০৬

[৩৬৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমার (রা.)কেও একই কথা বলে ফিরিয়ে দেন।[৩৬৪]

তারপর হযরত ওমার (রা.) হযরত আলী (রা.)কে বলেন– তুমিই ফাতিমা (রা.)-এর উপযুক্ত পাত্র। হযরত আলী (রা.) বলেন– আমার সম্পদের মধ্যে একটি মাত্র বর্ম ছাড়া তো আর কিছুই নেই। অত:পর হযরত আলী (রা.) নবী কারীম (স.)-এর নিকট ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করেন। রাসূল (স.) নিজ উদ্যোগে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে ফাতিমা (রা.)কে বিয়ে দেন। এ সংবাদ হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি কাঁদতে শুরু করেন। এরপর রাসূল কারীম (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন– 'ফাতিমা! আমি তোমাকে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বেশি বিচক্ষণ এবং প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিয়েছি।' এ ঘটনাটি ঘটে দ্বিতীয় হিজরীর মুহাররম মাসের প্রথম দিকে হযরত আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের চার বা সাড়ে চার মাস পরে। বিয়ের সাড়ে চার মাস পরে হযরত আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)কে ঘরে তুলে নেন। তখন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বয়স ছিল ১৫ বছর সাড়ে পাঁচ মাস এবং হযরত আলী (রা.)-এর বয়স ছিল ২১ বছর ৫ মাস।[৩৬৫] বিয়ের সময় রাসূল কারীম (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে ওল ভরা মিসরী কাপড়ে প্রস্তুত একটি বিছানা, নকশাকৃত একটি খাট, খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার একটি বালিশ, একটি মশ্‌ক, পানির জন্য দু'টি পাত্র, আটা তৈরির জন্য দু'টি যাতা, একটি পেয়ালা, দু'টো চাদর, দু'টো বাজুবন্দ ও একটি জায়নামায উপহার দিয়েছিলেন।[৩৬৬]

হযরত আলী (রা.) একটি ঘর ভাড়া করে স্ত্রী হযরত ফাতিমা (রা.)কে নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সে ঘরে বিত্ত-বৈভবের কোনো স্পর্শ ছিলো না। সেখানে কোনো মূল্যবান আসবাবপত্র, খাট-পালঙ্ক, জাজিম, গদি কোনো কিছুই ছিল না। হযরত আলী (রা.)-এর ছিল কেবল একটি ভেড়ার চামড়া, সেটি বিছিয়ে তিনি রাতে ঘুমাতেন এবং দিনে সেটি

---

[৩৬৪] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১১

[৩৬৫] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৯

[৩৬৬] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

মশ্‌কের কাজে ব্যবহার করতেন। কোনো চাকর-বাকর ছিলো না।[৩৬৭] হযরত ফাতিমা (রা.) একাই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। যাতা ঘুরাতে ঘুরাতে তাঁর হাতে কড়া পড়ে যায়, মশ্‌ক ভর্তি পানি টানতে টানতে বুকে দাগ হয়ে যায় এবং ঘর-বাড়ি ঝাড়ু দিতে দিতে কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে যেতো।[৩৬৮]

জিহাদের ময়দানে হযরত ফাতিমা (রা.) অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। উহুদের যুদ্ধে অন্যান্য মুহাজির ও আনসার নারীগণের সঙ্গে হযরত ফাতিমা (রা.)ও অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে রাসূল (স.) দেহে ও মুখে আঘাত পেয়ে মারাত্মক আহত হন। তাঁর পবিত্র দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কোনো কিছুতেই রক্ত বন্ধ করা যাচ্ছিল না, তখন হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূল (স.)কে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর মুখমন্ডলের রক্ত মুছতে লাগলেন। তারপর খেজুরের চাটাই আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন। তখন রক্তপড়া বন্ধ হয়।[৩৬৯]

অন্যান্য যুদ্ধেও হযরত ফাতিমা (রা.) অংশগ্রহণ করেন। যেমন খন্দক ও খাইবার অভিযানে যোগদান করেন। খাইবার বিজয়ের পর তথাকার উৎপাদিত গম থেকে তাঁর জন্য নবী কারীম (স.) ৮৫ ওয়াসক বরাদ্দ করেন। মক্কা বিজয়েও তিনি রাসূল (স.)-এর সফর সঙ্গী হন। মূতার যুদ্ধে রাসূল (স.) তিন সেনাপতি– হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা, হযরত জাফর ইব্‌ন আবী তালিব এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.)কে প্রেরণ করেন। সেখানে একে একে তিনজনই শাহাদাত বরণ করেন। এ সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর প্রিয় চাচা হযরত জাফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা.)-এর শোকে 'ওয়া আম্মাহ' বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এসময় রাসূল (স.) সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন– 'যে কাঁদতে চায় তার জাফরের মতো মানুষের জন্য কাঁদা উচিত।'[৩৭০]

---

[৩৬৭] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৩

[৩৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৯

[৩৬৯] *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২৪

[৩৭০] *নিসা মুবাশ্‌শারাত বিল জান্নাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর মর্যাদা অনেক বেশি। রাসূল কারীম (স.) একদিন ফাতিমা (রা.)কে বলেন– 'আল্লাহ তা'আলা তোমার খুশিতে খুশি হন এবং তোমার অসন্তুষ্টিতেই অসন্তুষ্ট হন।'[৩৭১] রাসূল (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে– سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 'জান্নাতের অধিবাসী নারীদের নেত্রী'– বলে ঘোষণা দেন। রাসূল (স.) যখন কোনো সফর থেকে ফিরতেন তখন প্রথমে মসজিদে যেয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করতেন, তারপর ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাত করে স্ত্রীদের কাছে যেতেন।[৩৭২]

রাসূল (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে খুবই ভালোবাসতেন। ফাতিমা সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেন– 'ফাতিমা আমার দেহের একটি অংশ। কেউ তাঁকে অসন্তুষ্ট করলে আমাকেই অসন্তুষ্ট করবে।'[৩৭৩]

রাসূল (স.)-এর ওফাতের সময় (১১ হিজরী) হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বয়স ছিল ২৯ বছর। রাসূল (স.) ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এসময় রাসূল (স.) হযরত ফাতিমা (রা.)কে ডেকে পাঠালেন। পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি হযরত আয়িশা (রা.)-এর গৃহে গমন করেন। রাসূল (স.)-এর শয্যাপাশে তখন হযরত আয়িশা (রা.)সহ অন্য স্ত্রীগণ ছিলেন। রাসূল (স.) অত্যন্ত স্নেহে হযরত ফাতিমা (রা.)কে নিজের কাছে বসালেন এবং কানে কানে বললেন, তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী। তখন হযরত ফাতিমা (রা.) কেঁদে ফেলেন। এরপর রাসূল (স.) পুনরায় তাঁর কানে কানে বলেন– 'আমার পরিবারবর্গের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তুমি জান্নাতে নারীদের নেত্রী হবে। এতে তুমি কি সন্তুষ্ট নও?' একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফাতিমা (রা.)-এর মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠে এবং তিনি কান্না থামিয়ে হেসে দিলেন।[৩৭৪] তাঁর এমন অবস্থা দেখে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন– হাসি কান্নার কারণ কী? উত্তরে ফাতিমা (রা.)

---

[৩৭১] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৬৬
[৩৭২] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৩৫
[৩৭৩] *সহীহ আল বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩২
[৩৭৪] প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৪১

Dhaka University Institutional Repository

বললেন– 'আমি রাসূল (স.)-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না।'[৩৭৫]

ইন্তিকালের পূর্বে রাসূল (স.) বারবার সংজ্ঞাহীন হয়ে যাচ্ছিলেন তখন ফাতিমা (রা.) অস্থির হয়ে যাচ্ছিলেন এবং বলেছিলেন– 'আব্বা! আপনার কষ্ট তো আমি সহ্য করতে পারছি না।' রাসূল (স.) বলেন– 'আজকের পর তোমার পিতার আর কোনো কষ্ট হবে না।'[৩৭৬] রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত ফাতিমা (রা.) দারুণভাবে শোকাতুর হয়ে পড়লেন। রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর কেউই হযরত ফাতিমা (রা.)কে হাসতে দেখেননি।[৩৭৭]

হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে ১৮ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ১ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত ফাতিমা (রা.) থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– তাঁর স্বামী আলী ইব্ন আবী তালিব, তাঁর দুই ছেলে হাসান, হুসাইন, হযরত আয়িশা, উম্মু কুলসুম, উম্মু সালামা (রা.), উম্মু রাফি (রা.), আনাস ইব্ন মালিক, ফাতিমা বিন্ত হুসাইন (রা.) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।[৩৭৮]

রাসূল (স.)-এর ওফাতের ৬ মাস পরই ১১ হিজরীর রমযান মাসে হযরত ফাতিমা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ২৯ বছর। ইন্তিকালের পূর্বে হযরত আসমা বিন্ত আমিস (রা.)কে ডেকে বলেছিলেন– আমার জানাযা ও দাফনের সময় পর্দার পুরো ব্যবস্থা রাখতে হবে ও তুমি ও আমার স্বামী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে গোসলের ব্যাপারে সাহায্য নেয়া যাবে না, দাফনের সময় বেশি ভীড় হতে দেয়া যাবে না।'[৩৭৯]

---

[৩৭৫] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৬
[৩৭৬] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩১৪
[৩৭৭] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫২৪
[৩৭৮] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত
[৩৭৯] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

Dhaka University Institutional Repository

ইন্‌তিকালের পর তাঁর ওসিয়্যাত অনুযায়ী তাঁর জানাযার ব্যবস্থা করা হয়। জানাযায় খুব কম মানুষ অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কারণ রাতে তাঁর ইন্‌তিকাল হয় এবং হযরত আলী (রা.) ফাতিমা (রা.)-এর ওসিয়্যাত অনুযায়ী রাতেই তাঁর দাফনের ব্যবস্থা করেন। হযরত আব্বাস (রা.) জানাযার নামায পড়ান এবং হযরত আলী (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত ফযল ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তাঁর লাশ কবরে নামান। দারু আকিলের এক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৮০]

হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভে ৬ টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন– হযরত ইমাম হাসান (রা.), হযরত ইমাম হুসাইন (রা.), হযরত মুহসিন (রা.), হযরত উম্মু কুলসুম (রা.), রুকাইয়্যা (রা.) এবং যায়নাব (রা.)। মুহসিন (রা.) ও রুকাইয়্যা (রা.) বাল্যকালেই ইন্‌তিকাল করেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.), ইমাম হুসাইন (রা.) এবং হযরত উম্মু কুলসুম (রা.) নামকরা ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাসূল (স.)-এর বংশধারা ফাতিমা (রা.)কে দিয়েই অব্যাহত ছিল।[৩৮১]

---

[৩৮০] প্রাগুক্ত

[৩৮১] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবশিষ্ট নারী সাহাবীগণের ভূমিকা

হযরত আসমা বিন্ত আবী বকর (রা.)

নাম আসমা। পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। তাঁর বংশধারা হলো– আসমা বিন্ত আবী বকর ইব্ন আবী কুহাফা উসমান ইব্ন আমের ইব্ন আমর ইব্ন কা'ব ইব্ন সা'দ ইব্ন তাইম ইব্ন মাররাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুব্বী কারাশী। মাতার নাম কাতিলাহ বিন্ত আবদিল উয্যা। হযরত আসমা (রা.)-এর নানা আবদুল উযযা কুরাইশ বংশের একজন বিখ্যাত নেতা ছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর সৎ বোন ছিলেন এবং বয়সে ছোট ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবী বকর (রা.) তাঁর সহোদর ছিলেন।[৩৮২]

হযরত আসমা (রা.)-এর স্বামী ছিলেন হযরত যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.)। তিনি জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্যতম। তাঁর শাশুড়ি হলেন রাসূল (স.)-এর ফুফু হযরত সাফিয়্যা বিন্ত আবদিল মুত্তালিব (রা.)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.) ছিলেন হযরত আসমা (রা.)-এর পুত্র। হিজরাতের ২৭ বছর পূর্বে হযরত আসমা (রা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বয়স ছিল ২০ বছরের কিছু বেশি। তিনি ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং হযরত আয়িশা (রা.)-এর চেয়ে দশ বছরের কিছু বেশি দিনের বড়।[৩৮৩]

হযরত আসমা (রা.)-এর উপাধি ছিল 'যাতুন নিতাকাইন'। রাসূল (স.) ও তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর (রা.) মদীনায় হিজরাতের প্রাক্কালে তিনি তাঁদের জন্য থলেতে কিছু

---

[৩৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

[৩৮৩] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮৮, ২৯৭

Dhaka University Institutional Repository

পাথেয় এবং একটি মশ্‌কে পানি দিচ্ছিলেন। রাসূল (স.) দ্রুত যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু পাথেয় সামগ্রীর মুখ বাঁধার জন্য হাতের নাগালে কোনো রশি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত আসমা (রা.) নিজের নিতাক বা কোমর বন্ধনী খুলে দুই টুকরো করে থলে ও মশ্‌কের মুখ বেঁধে দেন। তা দেখে রাসূল (স.) তাঁর জন্য এই বলে দু'আ করেন– 'আল্লাহ্ যেন একটি নিতাকের বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে দু'টি নিতাক দান করেন।' এ জন্য তিনি পরবর্তীতে 'যাতুন নিতাকাইন' (দুইটি কোমর বন্ধনীর অধিকারিণী) উপাধি লাভ করেন।[৩৮৪]

হযরত আসমা (রা.) রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি তখন একজন কিশোরী মাত্র। ইমাম নববী (র.) বলেন– 'হযরত আসমা (রা.) বহু আগে ১৭ জনের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।'[৩৮৫] কুরাইশদের যুল্‌ম-নির্যাতনের কারণে যখন মুসলমানগণ মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করছে, এমনই এক সময়ে হাওয়ারীয়ে রাসূল (স.) হযরত যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা.)-এর সঙ্গে হযরত আসমা (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল।[৩৮৬]

রাসূল (স.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) যখন মক্কা থেকে হিজরাত করে সাওর গিরি গুহায় অবস্থান করছেন, তখনও মুশরিকরা সারা রাত রাসূল (স.)-এর গৃহ ঘিরে রেখেছে। সকাল বেলা একথা ছড়িয়ে পড়লো যে, রাসূল (স.) ও আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাতের আঁধারে মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। তখন আবূ জাহ্‌ল ও মক্কার অন্যান্য মুশরিক নেতৃবৃন্দ বানু হাশিম ও তার শাখা গোত্রগুলোর বাড়িতে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে এক পর্যায়ে তারা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বাড়ি ঘেরাও করে। আবূ জাহ্‌ল এগিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দেয়। বাড়িতে তখন হযরত আসমা, তাঁর বোন হযরত আয়িশা এবং

---

[৩৮৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯; *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড পৃ. ৫৫১

[৩৮৫] *তাহযীব আল-আসমা ওয়াল লুগাত*, ইমাম মুহিউদ্দীন ইব্‌ন শারফ আন-নববী, আত্-তিবাআ আল-মুগীরিয়্যা, মিশর, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯৭

[৩৮৬] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আয়িশার মা উম্মু রূমান (রা.) ব্যতিত আর কেউ ছিলেন না। হযরত আসমা (রা.) দরজা খুলে বাইরে এলেন, আবূ জাহ্‌ল কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করলো– তোমার আব্বা কোথায়? হযরত আসমা (রা.) বললেন– 'আমার আব্বা কোথায় তা আমি জানি না।' একথা শোনার সাথে সাথে আবূ জাহ্‌ল তার একটি হাত উঁচু করে হযরত আসমা (রা.)-এর গালে সজোরে এক থাপ্পর বসিয়ে দেয়। তাতে তাঁর কানের দুলটি ছিড়ে গিয়ে দূরে পড়লো। হযরত আসমা (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য ধারণ করে নীরবে ঘরে চলে গেলেন।[৩৮৭]

রাসূল (স.) ও হযরত আবূ বকর (রা.) হিজরাত করে মদীনায় গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও অনুকূল হওয়ার পর রাসূল (স.) হযরত যায়িদ ইব্‌ন হারিসা (রা.) ও হযরত আবূ রাফিকে মক্কায় পাঠালেন পরিবারের নারী সদস্যদের মদীনায় নিয়ে আসার জন্য। হযরত আবূ বকর (রা.)ও তাঁদের সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আরীকাত (রা.)কে আবদুল্লাহর নামে একটি পত্র দিয়ে পাঠান। পত্রে তিনি আবদুল্লাহকে তাঁর মা উম্মু রূমান ও বোনদেরকে মদীনা নিয়ে আসার জন্য লিখেছিলেন। পত্র পেয়ে আবদুল্লাহ তার মা, দুই বোন আসমা ও আয়িশা (রা.) এবং পরিবারের আরো কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে মদীনার পথে গমন করেন। হযরত আসমা (রা.) তখন গর্ভবতী ছিলেন। মদীনার কুবা নামক স্থানে পৌঁছার পর গর্ভস্থ সন্তান আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের জন্ম হয়।[৩৮৮] হযরত আসমা (রা.) নবজাতককে নিয়ে রাসূল (স.)-এর কোলে রাখলেন। তিনি একটি খেজুর চিবিয়ে নবজাতকের মুখে দেন এবং তাঁর মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন।[৩৮৯] এ ছাড়া হযরত আসমা (রা.)-এর গর্ভে পুত্র আল-মুনযির, উরওয়া, আসিম, মুহাজির এবং কন্যা খাদীজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান ও আয়িশা জন্মগ্রহণ করেন।[৩৯০]

---

[৩৮৭] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

[৩৮৮] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৯২; আত-তাবাকাত, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১২৩

[৩৮৯] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫

[৩৯০] *হিলইয়াতুল আউলিয়া*, আবু নুয়াইম ইসফাহানী, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত, ১৯৬৭, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আসমা (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মুসলমান ছিলেন । কিন্তু তাঁর মা কাতিলাহ বিন্‌ত আবদিল উয্‌যা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেনি। এজন্য হযরত আবূ বকর (রা.) হিজরাতের পূর্বে তাকে তালাক দিয়েছিলেন। একবার কাতিলাহ মদীনা এলেন এবং হযরত আসমা (রা.)-এর নিকট কিছু অর্থ চাইলেন। কিন্তু সে মুশরিকা হওয়ার কারণে হযরত আসমা (রা.) অর্থ দেয়ার প্রশ্নে চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং রাসূল (স.)কে জিজ্ঞেস করলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মুশরিকা এবং সে আমার নিকট অর্থ চায় আমি কি তাকে সাহায্য করতে পারি?' তখন রাসূল (স.) বললেন– 'হ্যা, তোমার মায়ের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।' রাসূল (স.)-এর অনুমতি পেয়ে তিনি মাকে নিজের গৃহে থাকার অনুমতি দিলেন এবং অর্থ সাহায্য দেন।[৩৯১]

দান ও সাদকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার হস্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা.) তাঁর মা ও খালার দানশীলতার বর্ণনা দিয়ে বললেন– 'আমি আমার মা আসমা (রা.) ও খালা আয়িশা (রা.) থেকে অধিক দানশীলা কোনো নারী দেখিনি। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই ছিল যে, খালা হযরত আয়িশা (রা.) অল্প অল্প করে জমা করে যা হতো তা আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা হযরত আসমা (রা.) যখন যা পেতেন তখনই তা বন্টন করে দিতেন।'[৩৯২] হযরত আসমা (রা.) হযরত আয়িশা (রা.)-এর মিরাসী সম্পদের মধ্য থেকে সম্পত্তি পেয়েছিলেন । তিনি তা এক লক্ষ দিরহাম মুল্যে বিক্রি করে দিয়ে সকল অর্থ তাঁর আত্মীয় ও পরিজনদের মাঝে বিলি করে দেন।[৩৯৩]

হযরত আসমা (রা.) জীবনে কয়েকবার হাজ্জ করেছিলেন। রাসূল (স.)-এর সঙ্গে প্রথম হাজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন।[৩৯৪]

---

[৩৯১] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

[৩৯২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯২

[৩৯৩] *সহীহ আল-বুখারী*, বাবু হিবাতিল ওয়াহিদ লিল জামাআহ

[৩৯৪] *সহীহ মুসলিম*, মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, দারুল ইশাআত, করাচি, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আসমা (রা.) অত্যন্ত নির্ভীক সাহসী ছিলেন। শাম অভিযানে তিনি স্বামী হযরত যুবাইর (রা.)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যান্য কতিপয় নারীর মতো বিখ্যাত ইয়ারমুকের ভয়ংকর যুদ্ধের খিদমাত আনজাম দেন।

পারিবারিক জীবনের বেশ কয়েক বছর যাওয়ার পর হযরত যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা.) হযরত আসমা (রা.)কে তালাক প্রদান করেন। হযরত যুবাইর (রা.)-এর মেজাজ কিছুটা রুক্ষ ছিল। যার কারণে উভয়ের মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়। তালাকের পর আসমা (রা.) ছেলে আবদুল্লাহর নিকট চলে যান এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। পুত্র আবদুল্লাহ তাঁর মায়ের সীমাহীন খিদমত গুজার ছিলেন এবং মায়ের সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।[৩৯৫]

হযরত আসমা (রা.) হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনার ক্ষেত্রেও অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮ টি মতান্তরে ৫৬ টি। তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ১৪ টি, ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ৪ টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) এককভাবে ৪ টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৯৬] তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তাঁদের মধ্যে– তাঁর দু'পুত্র আবদুল্লাহ ও উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন উরওয়া, আবদুল্লাহ ইব্ন কায়সান, মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির, ইব্ন আব্বাস, সাফিয়্যা বিন্ত শায়বা, ইব্ন আবী মুলায়কা, মুসলিম মুনায়রা, ওয়াহাব ইব্ন কায়সান, আবূ ওয়াকিদ লাইসী, উম্মু কুলসুম মাওলাতুল হাজবা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৯৭]

হযরত আসমা (রা.)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইর (রা.) ৭৩ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ১৭ তারিখ শাহাদাত বরণ করেন। এর কয়েকদিন পরে ৭৩ হিজরীতে মক্কায় হযরত আসমা (রা.) ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল একশো

---

[৩৯৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ১২৪

[৩৯৬] *বানাত আস-সাহাবা*, আহমাদ খলীল জুম'আ, আল-যামামা, বৈরূত, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫, ৬৬

[৩৯৭] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বছর। মুহাজির পুরুষ ও নারী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ ইনতিকাল করেন।[৩৯৮] মক্কার আল-মু'আল্লাত গোরস্তানে ছেলে আবদুল্লাহ (রা.)-এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৩৯৯]

হযরত আসমা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে একজন মহান ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর কর্মময় জীবন মুসলমানদের জন্য এক আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে।

---

[৩৯৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬

[৩৯৯] *বানাত আস-সাহাবা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সাফিয়্যা বিন্ত আবদিল মুত্তালিব (রা.)

নাম সাফিয়্যা। পিতা আবদুল মুত্তালিব। সম্পর্কে তিনি রাসূল (স.)-এর ফুফু। অন্য দিকে রাসূল (স.)-এর মায়ের সৎ বোন হালা বিন্ত ওয়াহাব ছিলেন সাফিয়্যার মা। এ দিক দিয়ে সাফিয়্যার মা রাসূল (স.)-এর খালা। উহুদের শহীদ সাইয়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা.) তাঁর সহোদর ছিলেন। দুইজন একই মায়ের সন্তান।[৪০০]

হযরত সাফিয়্যা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারবের ভাই হারিস ইব্ন হারবের সঙ্গে। তার ঔরসে একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হারিসের মৃত্যুর পর আওয়াম ইব্ন খুওয়াইলিদের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। আওয়াম ইব্ন খুয়াইলিদ ছিলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর ভাই। তাঁর ঔরসে যুবাইর, সায়িব ও আবদুল কাবা– এই তিন পুত্রের জন্ম হয়।[৪০১]

রাসূল (স.) যখন নবুওয়্যাত লাভ করেন এবং মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) কোনো চিন্তা ভাবনা ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর ১৬ বছর বয়স্ক পুত্র হযরত যুবাইর (রা.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্বামী আওয়ামের সাথে মদীনায় হিজরাত করেন।[৪০২]

৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স.) মুসলিম নারীদেরকে সতর্কমূলকভাবে 'ফারে' অথবা 'উতুম' নামক দুর্গে স্থানান্তর করেন এবং কবি হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা.)কে এই দুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োগ করেন। এই নারীদের মধ্যে হযরত সাফিয়্যা (রা.)ও ছিলেন। দুর্গটি যদিও খুব মজবুত ছিল, তবুও ভীতির উর্ধে ছিল না। একদিন এক ইহুদী সে দিকে এলো এবং দুর্গে অবস্থানরত লোকদের সম্পর্কে তথ্য

---

[৪০০] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৯২

[৪০১] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৪২

[৪০২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রহ করতে লাগলো। ঘটনাক্রমে হযরত সাফিয়্যা (রা.) এই ইহুদীকে দেখে ফেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, লোকটি গুপ্তচর যদি সে নারীদের অবস্থান জেনে যায় এবং বানু কুরাইযার লোকদের বলে দেয় যে, দুর্গে শুধুমাত্র নারী ও শিশুরা রয়েছে তাহলে ভীষণ বিপদ আসতে পারে। কেননা রাসূল (স.) তাঁর বাহিনীসহ তখন জিহাদের ময়দানে অবস্থান করছেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) বিপদের ভয়াবহতা বুঝতে পেরে হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.)কে বাইরে বেরিয়ে ইহুদীকে হত্যা করার কথা বললেন। হযরত হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত (রা.) বললেন– আপনার জানা আছে, আমার কাছে এর কোনো প্রতিকার নেই। আমার যদি সেই সাহস থাকতো তাহলে আমি রাসূল (স.)-এর সাথেই যুদ্ধে থাকতাম। এ উত্তর শুনে হযরত সাফিয়্যা (রা.) তাৎক্ষণিক নিজেই তাঁবুর একটি খুটি উঠিয়ে ইহুদীর মাথার উপর এমনভাবে মারলেন যে, সেখানেই সে লাশ হয়ে পড়ে গেল। তারপর তিনি হযরত হাস্‌সান (রা.)কে বললেন– যাও, গিয়ে তার মাথা কেটে আনো। তিনি তাতেও ওজর পেশ করলেন। তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) নিজেই লোকটির মাথা কেটে দুর্গের নিচে ইহুদীদের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। বানু কুরাইযার ইহুদীরা কর্তিত মাথা দেখে মনে করলো যে, দুর্গের অভ্যন্তরেও মুসলমানদের সৈন্য আছে। বস্তুত তাদের আর দুর্গের উপর হামলার সাহস হলো না।[৪০৩]

তৃতীয় হিজরীতে উহুদ যুদ্ধেও হযরত সাফিয়্যা (রা.) অংশগ্রহণ করেন এবং সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ যুদ্ধে একটি ভুলের কারণে যখন যুদ্ধের ফলাফল পাল্টে গেল এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল, তখন হযরত সাফিয়্যা (রা.) একটি বর্শা হাতে নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে পলায়নপর সৈনিকদের যাকে সামনে পাচ্ছিলেন, তাকেই পিটাচ্ছিলেন আর ক্রোধের সঙ্গে বলছিলেন– তোমরা রাসূল (স.)কে ফেলে রেখে পালাচ্ছো? এমতাবস্থায় তিনি রাসূল (স.)-এর দৃষ্টিতে পড়েন। রাসূল (স.) তাঁর পুত্র যুবাইর (রা.)কে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন- তিনি যেন নিজের ভাই হযরত হামযা (রা.)-এর লাশ দেখতে না পান। হযরত হামযা (রা.) বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে যুবাইর ইব্‌ন

[৪০৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

Dhaka University Institutional Repository

মাত্আমের গোলাম ওয়াহশি ইব্ন হারবের বর্শার আঘাতে শহীদ হয়েছিলেন । হিন্দ বিন্ত উতবা নিজের পিতা উতবার (বদরের যুদ্ধে নিহত) প্রতিশোধের আবেগে তাঁর লাশ নাক ও কান কেটে ফেলেছিল। হযরত হামযা (রা.)-এর পেট চিরে কলিজা বের করে চিবিয়ে ফেলেছিল। ভাইয়ের লাশের এমন বিভৎস অবস্থা দেখে হযরত সাফিয়্যা (রা.) ধৈর্য হারা হয়ে যেতে পারেন, এমন চিন্তা করেই রাসূল (স.) এমন নির্দেশ দেন। হযরত যুবাইর (রা.) তাঁর নিকট এসে বললেন– মা, রাসূল (স.) আপনাকে ফিরে যাবার কথা বলেছেন। উত্তরে তিনি বলেন– 'আমি জেনেছি, আমার ভাইয়ের লাশ বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহর কসম! আমার ভাইয়ের লাশের সাথে এমন আচরণ আমার মোটেও পছন্দ নয়। কিন্তু আমি ধৈর্য ধারণ করবো, ইন্শাআল্লাহ!' মায়ের এসব কথা হযরত যুবাইর (রা.) রাসূল (স.)কে জানালে তিনি হযরত সাফিয়্যা (রা.)কে ভাইয়ের লাশের কাছে যাবার অনুমতি প্রদান করেন। তিনি শোকাভিভূত অবস্থায় লাশের নিকট আসেন এবং প্রিয় ভাইয়ের শরীর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় দেখে 'আহ' উচ্চারণ করেন এবং মুখে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে তাঁর মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করতে থাকেন ।[৪০৪]

হযরত সাফিয়্যা (রা.) একজন কবি এবং একজন সুভাষিণী নারী ছিলেন। আরবী ভাষাকে বেশ ভালোভাবেই আয়ত্বে আনেন। তাঁর মুখ থেকে অবাধ গতিতে কবিতার শ্লোক বের হতো। তিনি যখন শিশু সন্তান যুবাইরকে কোলে নিয়ে দোলাতেন তখন তাঁর মুখ থেকে বীরত্ব ব্যাঞ্জক কবিতার শ্লোক বের হতে থাকতো।[৪০৫]

হযরত সাফিয়্যা (রা.) ২০ হিজরীতে হযরত ওমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৩ বছর। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত সাফিয়্যা (রা.) তীক্ষ্ণ ধী সম্পন্ন দূরদর্শী ও ধৈর্যশীলা নারী ছিলেন এবং সমগ্র আরবে নিজের বংশ, কথা ও কাজের দিক থেকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

---

[৪০৪] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত

[৪০৫] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা.)

নাম আসমা। উপনাম উম্মু সালামা মতান্তরে উম্মু আমির। তাঁর বংশধারা হলো– আসমা বিন্ত ইয়াযীদ ইব্ন আস্-সাকান ইব্ন রাফে ইব্ন ইমরুল কায়িস ইব্ন যায়িদ ইব্ন আবদিল আশ্হাল ইব্ন জাসাম ইব্ন হারিস ইব্ন খাযরাজ ইব্ন আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আউস।[৪০৬] তাঁর মাতার নাম উম্মু সা'দ ইব্ন হুয়াইস ইব্ন মাসউদ। তার স্বামী সাঈদ ইব্ন আম্মার– যিনি আবূ সাঈদ আনসারী নামে পরিচিত।[৪০৭] আত্মীয়তার দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুয়ায ইব্ন জাবাল (রা.)-এর ফুফাতো বোন।[৪০৮]

রাসূল (স.)-এর মদীনায় হিজরাতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী দারুণ বাকপটু মহিলা। মহিলাদের পক্ষ থেকে নবী কারীম (স.)-এর নিকট বক্তব্য পেশ করার জন্য তাঁকে বলা হতো– নারীদের মুখপাত্রী। রাসূল (স.) মদীনায় এসেছেন। তিনি একদিন সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসে আছেন। এমন সময় হযরত আসমা (রা.) এলেন এবং রাসূল (স.)কে লক্ষ্য করে বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলিম নারীদের পক্ষ থেকে বিশেষ আবেদন নিয়ে আপনার নিকট এসেছি। মহান আল্লাহ আপনাকে পুরুষ-নারী উভয়ের পথপ্রদর্শক করে প্রেরণ করেছেন। আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আপনার অনুসরণ করছি। কিন্তু আমরা নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান লক্ষ্য করি। আমরা নারী সম্প্রদায় ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি। স্বামীর যৌন তৃপ্তি পূরণ করি এবং সন্তানদের লালন-পালন করি। আর আপনারা পুরুষেরা জুমু'আ, জামাআতে সালাত ও জানাযায় অংশ নিতে পারেন। হাজ্জে যেতে পারেন এবং জিহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। আর আমরা নারীরা তখন আপনাদের সন্তানদের লালন-পালন করি, সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং চরকায়

---

৪০৬ *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৯

৪০৭ *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৯

৪০৮ *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, আহমাদ খলীল জু'মআ, দারু তায়্যিবাহ আল-খাদরা, মক্কা, ২য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

কাপড় তৈরির জন্য সূতা কাটি। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, আমরা কি আপনাদের পূণ্যের অংশীদার হবো না?' রাসূল (স.) এ বক্তব্য শুনে সাহাবীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, তোমরা দ্বীন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এর চেয়ে উত্তম কোনো নারীর কথা কি শুনেছো? সাহাবীগণ উত্তরে বললেন, আমাদের তো কল্পনাও ছিলো না যে, একজন নারী এমন প্রশ্ন করতে পারে। রাসূল (স.) আসমা (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'নারী যদি তার স্বামীর সঙ্গে সদাচরণ করে, তার আনুগত্য করে, দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তবে সেও পুরুষের সমান পূণ্যের অধিকারী হবে।' রাসূল (স.)-এর এ বক্তব্য শুনে হযরত আসমা (রা.) আনন্দের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবর' পাঠ করতে করতে ফিরে যান।[৪০৯]

হযরত আসমা (রা.)-এর একটি বড় গুন হলো তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা। তিনি এবং তাঁর সকল আত্মীয়-স্বজন আল্লাহ ও রাসূল (স.)কে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল কুরবানী করার জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বদর যুদ্ধে আবদুল আশ্হালের পরিবারের সবাই জীবন বাজি রেখে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আসমা (রা.)-এর কয়েকজন নিকট আত্মীয়ও ছিলেন। তাছাড়া উহুদ যুদ্ধসহ রাসূল (স.)-এর মাদানী জীবনের প্রতিটি সংকটকালে এই পরিবারের লোকেরা তাদের জীবনের বিনিময়ে রাসূল (স.)-এর নিরাপত্তা বিধান করেছেন। উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূল (স.) ৭ জন আনসার ও ২ জন কুরাইশসহ মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শত্রুর আঘাতে একপর্যায়ে রাসূল (স.) আহত হন। তখন রাসূল (স.) তাঁর সঙ্গের ক'জন মুজাহিদকে লক্ষ্য করে বললেন কে আছে যে, এই দুশমনদের প্রতিহত এবং সত্যের পথে নিজের জীবন বিক্রি করবে? সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের এক ব্যক্তি সামনে এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করে শহীদ হন। রাসূল (স.) আবারো পূর্বের মতো একই কথা বললেন। এবারো একজন আনসারী এগিয়ে এলেন এবং যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। এভাবে একে একে ৭ জন আনসারীই বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবন রাসূল (স.)-এর উপর কুরবানী করে

---

[৪০৯] উসুদুল গাবা, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

দিলেন।[৪১০] এর ৭ম জন ছিলেন হযরত আসমা (রা.)-এর ভাই হযরত আম্মার ইব্ন ইয়াযীদ (রা.)। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। তাঁর শরীরে ১৩ টি আঘাত লেগেছিল, কিন্তু পিছু হটার নামও নেননি। অবশেষে ১৪তম আঘাতে তিনি ঢলে পড়লেন। লোকজন মনে করলো তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। রাসূল (স.)কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন– 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' লোকজন তৎক্ষনাৎ দৌড়ে তাঁর নিকট গেলো। গিয়ে দেখলো যে, তখনও শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। উঠিয়ে এনে রাসূল (স.)-এর সামনে রাখা হলো। কথা বলার শক্তি ছিল না। রাসূল (স.) নিজের পায়ের উপর তাঁর মাথা রেখে তাকে শুইয়ে দিলেন। এই অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যু হয়। এই উহুদ যুদ্ধে হযরত আসমা (রা.)-এর পিতা ইয়াযীদ, আসমা (রা.)-এর আরেক ভাই আমির এবং চাচা যিয়াদ ইব্ন যাকান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।[৪১১]

হযরত আসমা (রা.)ও রাসূল (স.)-এর সঙ্গে অনেকগুলো অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। বাইআতে রিদ্ওয়ান, মক্কা বিজয় ও খাইবার অভিযান তার মধ্যে অন্যতম। ১৫ হিজরীতে হযরত আসমা (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁবুর খুটি দিয়ে পিটিয়ে একাই ৯ জন রোমান সৈন্যকে হত্যা করেন।[৪১২]

হযরত আসমা (রা.) রাসূল (স.)-এর অত্যন্ত খিদমত করতেন। একবার তিনি রাসূল (স.)-এর 'আদ্বা' নামক উটের রশি ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন সময় রাসূল (স.)-এর উপর ওহী নাযিল হয়। হযরত আসমা (রা.) বলেন– 'ওহীর ওজন এত বেশি ছিল যে, আশংকা হয়েছিল যে, উটের হাত-পা ভেঙ্গে না যায়।'[৪১৩]

---

[৪১০] *সহীহ মুসলিম*, বাবু গাযওয়াতি উহুদ

[৪১১] *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৮০

[৪১২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৭

[৪১৩] *মুসনাদ ইমাম আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪৫৫,৪৪৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আসমা (রা.) মেহমানদের খিদমত করতে ভালোবাসতেন। একবার প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত শাহর ইব্ন হাওশাব (র.) তাঁর বাড়িতে এলেন। হযরত আসমা (রা.) তাঁর সামনে অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে খাবার পরিবেশন করলেন। তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন হযরত আসমা (রা.) রাসূল কারীম (স.)-এর একটি ঘটনা শুনিয়ে তাঁকে বললেন, এখন তো আর খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবেনা। শাহর ইব্ন হাওশাব (র.) বললেন– আম্মা! এই ধরণের ভুল আর করবো না।[৪১৪]

হযরত আসমা (রা.) প্রায়ই রাসূল (স.)-এর গৃহে আগমন করতেন। একদিন তাঁর সামনে রাসূল (স.) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এতে তিনি খুব প্রভাবিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। এ অবস্থায় রাসূল (স.) উঠে বাহিরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন তখনো তিনি কেঁদেই চলেছেন। রাসূল (স.) জিজ্ঞেস করলেন– কাঁদছো কেন? তিনি উত্তরে বললেন– আমাদের অবস্থা এমন যে, দাসী আটা বানিয়ে রুটি তৈরি করবে, এদিকে আমাদের ক্ষুধাও বেড়ে যায়। তার খাবার তৈরি শেষ না হতেই আমরা খাবারের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। এতটুকু সময়ের ক্ষুধাও আমরা সহ্য করতে পারি না। দাজ্জালের সময় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে তাতে আমরা ধৈর্য ধরবো কেমন করে? অতঃপর রাসূল (স.) তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন– 'সে দিন তাসবীহ ও তাকবীর ক্ষুধা থেকে রক্ষা করবে? অতএব কান্নার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি যদি তখনো জীবিত থাকি তাহলে মুসলমানদের রক্ষার জন্য বুক পেতে দেব। আর যদি দাজ্জালের আগমন আমার পরে হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি মুসলমানকে রক্ষা করবেন।'[৪১৫]

হযরত আসমা (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (স.)-এর ওফাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় রাসূল কারীম (স.)-এর সাহচর্য ও সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেন। রাসূল (স.)-এর কথা শুনতেন এবং স্মরণ রাখতেন। বিভিন্ন সময়ে রাসূল (স.)-এর নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে

---

[৪১৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৮
[৪১৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৫৩ - ৪৫৪

Dhaka University Institutional Repository

জেনে নিতেন। এ কারণে আনসারী নারী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীর মর্যাদা লাভ করেন। তিনি রাসূল (স.) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ৮১টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৪১৬] হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা.) থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে–ার ভাগ্নে মাহমুদ ইব্ন আমর আল-আনসারী, আবূ সুফিয়ান মাওলা ইব্ন আহমাদ, মুহাজির ইব্ন আবী মুসলিম, আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত, মুজাহিদ ইব্ন যুবাইর ও শাহর ইব্ন হাওশাব প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪১৭]

হযরত আসমা (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধের বেশ কিছুদিন পরে দিমাশ্কে ইন্তিকাল করেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক সন জানা যায় না। দিমাশ্কে বাবুস সাগীরে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪১৮]

---

৪১৬ *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮০
৪১৭ *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ.৪২৮
৪১৮ *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২০, ২৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু আইমান (রা.)

নাম বারাকা। উপনাম উম্মু আইমান। ডাকনাম উম্মিজ জুবা। তাঁর বংশধারা হলো– বারাকা বিন্ত সালাবা ইব্ন আমর ইব্ন হিসন ইব্ন মালিক ইব্ন সালামা ইব্ন আমর ইব্ন আন-নুমান।[৪১৯] হযরত উম্মু আইমান (রা.) ছিলেন হাবশী কন্যা। তিনি রাসূল (স.)-এর জন্মের পূর্বে প্রাপ্ত বয়স্ক হন এবং শৈশবকাল থেকেই রাসূল (স.)-এর পিতা আবদুল্লাহর দাসী ছিলেন। আবদুল্লাহর মৃত্যু হলে তিনি রাসূল (স.)-এর মাতা আমিনার খিদমতে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল (স.)-এর দেখাশুনার দায়িত্ব অনেকটা তাঁর উপর ন্যস্ত ছিলো। উত্তরাধিকারী সূত্রে রাসূল (স.) তাঁকে দাসী হিসেবে লাভ করেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর সাথে বিয়ের পর রাসূল (স.) তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন।[৪২০]

রাসূল (স.) হযরত উম্মু আইমান (রা.)কে অত্যন্ত সম্মান করতেন। মাঝে মাঝে মা বলেও সম্বোধন করতেন এবং বলতেন– 'উম্মু আইমান আমার মায়ের অবর্তমানে আমার মা।'[৪২১]

হযরত উম্মু আইমান (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল উবাইদ ইব্ন আমর আল-খাযরাজীর সঙ্গে। বিয়ের কিছুদিন পর উবাইদ উম্মু আইমান (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে ইয়াস্‌রিবে চলে যান। সেখানেই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আইমান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্মের পর উবাইদ বেশিদিন জীবিত ছিলেন না। রাসূল (স.)-এর হিজরাতের কিছুদিন পূর্বে উবাইদ মৃত্যুবরণ করলে হযরত উম্মু আইমান (রা.) পুনরায় মক্কায় রাসূল (স.)-এর পরিবারে ফিরে আসেন। রাসূল (স.)-এর পরিবারে তিনি বিধবা অবস্থায় জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দেন। একদিন রাসূল (স.) মক্কায় সাহাবীদের সমাবেশে বললেন–

---

৪১৯ *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৮ খন্ড, পৃ. ২১২
৪২০ *সিয়ারু সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭
৪২১ *আল-ইসতিয়ার*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৭৯৪

Dhaka University Institutional Repository

'যদি কোন ব্যক্তি জান্নাতের অধিকারিণী কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে সে হযরত উম্মু আইমান (রা.)কে বিয়ে করতে পারে।' একথা শুনে রাসূল (স.)-এর পালিত পুত্র হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) তাঁকে বিয়ে করলেন।[৪২২] যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)-এর ঘরে বিখ্যাত সেনানায়ক হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত উম্মু আইমান (রা.) নবুওয়্যাতের প্রাথমিক পর্বে ইসলাম কবুল করেন। প্রথম পর্বের মুসলমানগণ যে নির্যাতনের মুখোমুখি হয়েছিলেন হযরত উম্মু আইমান (রা.)ও সেই যুল্‌ম-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাননি। নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছলো, তখন রাসূল (স.) নবুওয়্যাতের ৫ম বছরে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরাতের অনুমতি দেন। তখন অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে তিনিও হাবশায় হিজরাত করেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে আবার স্বামী হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.)-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন।[৪২৩]

তিনি উহুদ ও খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদদের পানি পান করানো এবং আহতদের সেবা শুশ্রুষার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। হারিস ইব্ন হাতিব, সালাবা ইব্ন হাতিব, সাওয়াদ ইব্ন গাযিয়া, সা'দ ইব্ন উসমানসহ কয়েকজন ব্যক্তি উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসেন। হযরত উম্মু আইমান (রা.) তাঁদের ভীষণ তিরস্কার করেন, তাঁদের মুখে ধুলো ছুড়ে মারেন এবং তাদেরকে বলতে থাকেন– যাও, চরকা আছে,. সূতা কাট।[৪২৪]

হযরত উম্মু আইমান (রা.) আজীবন রাসূল (স.)-এর পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি রাসূল (স.)কে কোলে করে লালন-পালন করেন এবং তাঁর পিতা-মাতা, দাদা ও অন্যান্য ব্যক্তিদেরকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ের সময়ও তিনি সবার অগ্রভাগে ছিলেন। ৮ম হিজরীতে রাসূল (স.)-এর কন্যা হযরত যায়নব (রা.)-এর ওফাত হলে তিনি তাঁর গোসলে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বে রাসূল (স.)-এর অপর

---

৪২২ *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৫২৯

৪২৩ *সিয়ারুস সাহাবিয়াত*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১১

৪২৪ *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ.৩২০

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-এর ওফাত হলে তাঁকে গোসল দেন হযরত উম্মু আইমান (রা.)। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাত হলে তাকে গোসল দেন হযরত উম্মু আইমান (রা.) ও হযরত উম্মুল ফাদল (রা.)।[৪২৫]

একদিন রাসূল (স.) হযরত উম্মু আইমান (রা.)-এর বাড়িতে গেলেন। তিনি রাসূল (স.)কে পান করার জন্য শরবত দেন। রাসূল (স.) তখন সাওম অবস্থায় ছিলেন বলে শরবত পানে অনীহা প্রকাশ করেন। তাতে উম্মু আইমান (রা.) রেগে গেলেন। সম্ভবত তিনি রাসূল (স.)-এর সাওমের কথা জানতেন না। এ সত্ত্বেও রাসূল (স.) তাঁর কথায় কিছু মনে করেননি।[৪২৬]

রাসূল (স.) তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। মাঝে মাঝে তার সাথে কৌতুকও করতেন। একদিন হযরত উম্মু আইমান (রা.) রাসূল (স.)-এর কাছে এসে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি উট প্রয়োজন। রাসূল (স.) বললেন– আপনি উট দিয়ে কি করবেন? তিনি উত্তরে বললেন– আজকাল আমার নিকট সওয়ারীর কোনো বাহন নেই। কোনো সময় দূরের সফর হলে তখন খুব কষ্ট হয়। রাসূল (স.) মুচকী হেসে বললেন– আপনাকে উটের একটি বাচ্চা দিয়ে দেই। তিনি বললেন– বাচ্চা তো আমার ভার বহন করতে পারবে না। রাসূল (স.) বললেন– আমিতো উটের বাচ্চার পিঠেই আপনাকে সাওয়ার করাবো। আসলে রাসূল (স.) তাঁর সাথে একটু কৌতুক করছিলেন। কারণ সব উটই কোনো না কোনো উটের বাচ্চা।[৪২৭]

মূতার যুদ্ধে উম্মু আইমান (রা.)-এর স্বামী হযরত যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। এতে তিনি খুব শোকাহত হন। তা সত্ত্বেও রাসূল (স.)-এর অভিভাবকত্ব ও আন্তরিকতায় তাঁর দুঃখের অনেকখানিই লাঘব হয়।[৪২৮]

---

৪২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০০, ৪০১, ৪০৬
৪২৬ *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪১
৪২৭ *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯
৪২৮ *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর ওফাত হলে উম্মু আইমান (রা.) ভীষণ দু:খ পান এবং শোকে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁর কান্না আর থামতে চায় না। হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা.) ও ওমার ফারুক (রা.) তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, 'আপনি কাঁদছেন কেন? পৃথিবীর তুলনায় আল্লাহ তাআলার কাছে রাসূল (স.)-এর জন্য আরো উত্তম নিয়ামত মজুদ আছে।' হযরত উম্মু আইমান (রা.) উত্তরে বললেন– 'আমি তো তা জানি। আমি কাঁদছি এজন্য যে, এখন আমাদের কাছে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেল।' একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমার (রা.) আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং দু'জনই কাঁদতে শুরু করলেন।[৪২৯]

হযরত উম্মু আইমান (রা.) রাসূল (স.) থেকে ৫ টি হাদীস বর্ণনা করেন।[৪৩০] তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.), হান্‌শ ইব্‌ন আবদিল্লাহ সানআলী এবং আবূ ইয়াযীদ মাদানী (রা.) প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৩১] তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে সুদীর্ঘ বয়সে ইন্‌তিকাল করেন।[৪৩২]

---

[৪২৯] প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬

[৪৩০] প্রাগুক্ত, পৃ.২২৭

[৪৩১] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২ খন্ড, পৃ.৪৮৬

[৪৩২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু হানী বিন্ত আবী তালিব (রা.)

নাম ফাখ্তা। কেউ বলেছেন ফাতিমা। আবার কেউ হিন্দও বলেছেন। উপনাম উম্মু হানী। তিনি রাসূল (স.)-এর চাচা আবূ তালিবের কন্যা। মাতার নাম ছিলো ফাতিমা বিন্ত আসাদ। হযরত জাফর তাইয়ার (রা.), তালিব, আকীল (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর সহোদর ছিলেন।[৪৩৩]

রাসূল (স.) নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে চাচা আবূ তালিবের নিকট উম্মু হানীর বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আবূ তালিব এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে হুবাইরা ইব্ন আমর ইব্ন আয়িয আল-মাখযুমীর সঙ্গে হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর বিয়ে দেন।[৪৩৪]

হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে সকল ঐতিহাসিকই ঐকমত্য পোষণ করেন। তবে তিনি কখন ইসলাম গ্রহণ করেন এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, তিনি ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। আবার কেউ বলেছেন, তিনি অন্যতম প্রবীণ মুসলিম ছিলেন, অবশ্য নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা লুকিয়ে রেখে ছিলেন।[৪৩৫] রাসূল (স.)-এর মিরাজ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, রাসূল (স.)-এর মিরাজ হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর ঘর থেকে হয়েছিল এবং তিনি তখন একজন মুসলমান। আর এটা হিজরাতের পূর্বের ঘটনা।[৪৩৬]

মক্কা বিজয়ের সময় হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর স্বামী হুবাইরা মুশরিক অবস্থায় নাজরানের দিকে পালিয়ে যান। হুবাইরা কুফরীর উপর অটল থাকে এবং এ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। হযরত উম্মু হানী (রা.) ইসলাম গ্রহণের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর রাসূল (স.) তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জবাবে তিনি বলেন– 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি

---

৪৩৩ *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১২

৪৩৪ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.৯৮

৪৩৫ *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৩

৪৩৬ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জাহিলী যুগেই আপনাকে ভালোবাসতাম। এখন ইসলামী যুগে তো সে ভালোবাসা আরো গভীর হয়েছে। তবে এখন আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে। তাছাড়া আমার সন্তানও রয়েছে। আমার আশংকা তারা আপনাকে কষ্ট দিবে।'[৪৩৭]

রাসূল (স.)-এর প্রতি ছিল হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ। মক্কা বিজয়ের সময়ে একদিন রাসূল (স.) তাঁর গৃহে গমন করেন। তিনি রাসূল (স.)কে শরবত পান করতে দেন। রাসূল (স.) শরবতের কিছু অংশ পান করে বাকী অংশ উম্মু হানী (রা.)-এর দিকে এগিয়ে দেন। উম্মু হানী (রা.) তা পান করলেন এবং বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি রোযা ছিলাম এবং শরবত পান করে ফেলেছি।' রাসূল (স.) এভাবে রোযা ভাঙ্গার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন– 'আমি আপনার মুখ লাগানো শরবত পানের সুযোগ ছেড়ে দিতে চাইনি।'[৪৩৮]

মক্কা বিজয়ের সময় বানু মাখযুমের দুই ব্যক্তি হারিস ইব্ন হিশাম ও যুহাইর ইব্ন উমাইয়া হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর গৃহে আশ্রয় নেন। হযরত আলী (রা.) এ কথা জানতে পেরে তরবারি হাতে বোনের বাড়ি পৌঁছে তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে দু'জনকেই হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন উম্মু হানী (রা.) বললেন– তারা আমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাদেরকে হত্যা করতে দেব না। অত:পর তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপর তিনি দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (স.)-এর কাছে গিয়ে বললেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই দুইজনকে আশ্রয় দিয়েছি আর আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করতে চায়।' রাসূল (স.) বললেন– 'তুমি যাদেরকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাদেরকে আশ্রয় দিলাম।'[৪৩৯] এই ঘটনার পর হারিস ইব্ন হিশাম ও যুহাইর ইব্ন উমাইয়া দু'জনই মুসলমান হয়ে গেলেন।[৪৪০]

---

৪৩৭ *আসহাবে রাসূলের জীবন কথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.১০১

৪৩৮ *মুসনাদে আহমাদ, প্রাগুক্ত*, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.৩৪৩

৪৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭৪

৪৪০ *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধ বয়সে একবার হযরত উম্মু হানী (রা.) রাসূল (স.)-এর নিকট আরজ করেন– 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। চলাফেরায় খুব দুর্বলতা অনুভব করি। আমাকে এমন কিছু আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে করতে পারি। রাসূল (স.) তাঁকে ১০০ বার সুব্হানাল্লাহ্, ১০০ বার আল্হামদুলিল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আক্বার এবং ১০০ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়তে বলেন।[৪৪১]

হযরত উম্মু হানী (রা.) রাসূল (স.) থেকে ৪৬ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর মধ্যে একটি হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যৌথভাবে সংকলন করেছেন।[৪৪২] তাঁর থেকে যে সকল বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– জাদাহ, ইয়াহইয়া, হারুন, আবূ মুররা, আবূ সালিহ, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস, আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা, শা'বী, আতা, কুরাইব, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন উকবা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৪৩]

হযরত উম্মু হানী (রা.)-এর ওফাতের সময়কাল সঠিকভাবে জানা যায় না। 'আল-ইসাবা' গ্রন্থে বলা হয়েছে, তিনি হযরত আলী (রা.)-এর ওফাতের পরও জীবিত ছিলেন।[৪৪৪] ইমাম যাহাবী (র.) বলেন– তিনি ৫০ হিজরীর পরও জীবিত ছিলেন।[৪৪৫]

---

৪৪১ *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.৩৪৪

৪৪২ *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৪

৪৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৩১২

৪৪৪ *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৮৭

৪৪৫ *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা.)

নাম আসমা। পিতার নাম উমাইস। ডাক নাম উম্মু আবদিল্লাহ।[৪৪৬] তাঁর বংশধারা হলো– আসমা বিন্‌ত উমাইস ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন তীম ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কাহফ ইব্‌ন আমের ইব্‌ন রাবিয়্যা ইব্‌ন গানিম ইব্‌ন মু'আবিয়া ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বিশর ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন শাইবা ইব্‌ন আফরাস ইব্‌ন খাল্‌ফ ইব্‌ন আক্‌বাল আলখাস আমিয়্যা।[৪৪৭] মায়ের নাম খাওলা বিন্‌ত আওফ। যিনি হিন্দা নামেও পরিচিত। হযরত আসমা (রা.) কিনানা গোত্রের মেয়ে। তিনি ছিলেন উম্মুল মু'মিমীন হযরত মাইমুনা (রা.)-এর সৎবোন।[৪৪৮]

হযরত আলী (রা.)-এর বড় ভাই প্রখ্যাত সাহাবী হযরত জাফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।[৪৪৯] রাসূল (স.) মক্কায় দারুল আরকামে অবস্থান গ্রহণের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরই কাছাকাছি সময়ে তাঁর স্বামী হযরত জাফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা.)ও মুসলমান হন। এর পূর্বে ৩০ জন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন।[৪৫০]

নবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ বছরে হযরত আসমা বিন্‌ত উমাইস (রা.) স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরাত করেন। কয়েক বছর হাবশায় অবস্থান করে ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের সময় তাঁরা মদীনায় পৌঁছেন।[৪৫১]

৮ম হিজরীতে ঐতিহাসিক মূতার যুদ্ধে হযরত আসমা (রা.)-এর স্বামী হযরত জাফর ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) দ্বিতীয় সেনাপতি হিসেবে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শাহাদাত

---

[৪৪৬] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮২
[৪৪৭] *আল-ইসাবা, প্রাগুক্ত*, ৮ম খন্ড, পৃ. ৮
[৪৪৮] *সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
[৪৪৯] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৮০
[৪৫০] প্রাগুক্ত
[৪৫১] *আনসাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

বরণ করেন। এ ঘটনার ৬ মাস পর ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে হুনাইন যুদ্ধের সময়ে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে হযরত আসমা (রা.)-এর বিয়ে হয়।[৪৫২] ১৩ হিজরীতে দ্বিতীয় স্বামী হযরত আবূ বকর (রা.) ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় স্বামীর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত আসমা (রা.)-এর তৃতীয় ও শেষ বিয়ে হয়।[৪৫৩]

হযরত আসমা (রা.)-এর গর্ভে হযরত জাফর ইব্ন আবী তালিব (রা.)-এর ঔরসে মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ও আওন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঔরসে মুহাম্মদ এবং হযরত আলী (রা.)-এর ঔরসে ইয়াহইয়া জন্মগ্রহণ করেন।[৪৫৪]

হযরত আসমা (রা.) রাসূল (স.) থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন। বিপদ-আপদে পড়ার জন্য রাসূল (স.) তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে দেন। আসমা (রা.) সেটি পাঠ করতেন।[৪৫৫] তাছাড়া তিনি হাবশায় অবস্থানকালে সেখানকার বিশেষ ধরণের টোটকা রোগের চিকিৎসার জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি স্বপ্নের তাবীরও ভালো জানতেন। হযরত ওমার (রা.) তাঁর কাছ থেকেই সাধারণত স্বপ্নের ব্যাখ্যা জেনে নিতেন।[৪৫৬]

হযরত আসমা (রা.) রাসূল (স.) হতে ৬০ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইব্ন শাদ্দাদ, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, উম্মু আওন বিন্ত মুহাম্মদ ইব্ন জাফর, ফাতিমা বিন্ত আলী (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৫৭]

---

[৪৫২] *আল-ইসাবা,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৯
[৪৫৩] *আত-তাবাকাত,* প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৮৫
[৪৫৪] *আসমাউস সাহাবা ওয়ার রুয়াত,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
[৪৫৫] *মুসনাদে আহমাদ,* প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৬৯
[৪৫৬] *হায়াতুস সাহাবা,* প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৫০
[৪৫৭] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৪০ হিজরীতে হযরত আসমা (রা.)-এর তৃতীয় স্বামী হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। এর কিছুদিন পরে হযরত আসমা (রা.)ও ইন্তিকাল করেন।[৪৫৮]

হযরত উম্মুল ফাদল বিন্ত হারিস (রা.)

নাম লুবাবা। উপনাম উম্মুল ফাদল। উপাধি আল-কুবরা। তাঁর বংশধারা হলো– উম্মুল ফাদল লুবাবা বিন্ত হারিস ইব্ন হাযান ইব্ন বুযাইর ইব্ন হুযাম ইব্ন রাওবিয়া ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন হিলাল ইব্ন আমের ইব্ন সা'সায়া। মায়ের নাম ছিল হিন্দ (অথবা খাওলাহ) বিন্ত আওফ আল-কিনানিয়্যা। তিনি বানু কিনানাহ বা হুমাইর গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।[৪৫৯]

রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সুতরাং তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর গর্বিতা চাচী। তাঁর সহোদরা হযরত মাইমুনা বিন্ত হারিসা (রা.) উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।[৪৬০]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর পর মক্কার নারীদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৬১] প্রাথমিক যুগের মুসলমান হলেও স্বামী হযরত আব্বাস (রা.)-এর মদীনায় হিজরাতের পূর্ব পর্যন্ত অনেক নির্যাতন সহ্য করেও মক্কাতেই অবস্থান করেন। হযরত আব্বাস (রা.) অনেক বিলম্বে প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন। আর তখনই উম্মুল ফাদল (রা.) তাঁর সন্তানদেরসহ মদীনায় হিজরাত করেন। মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বে এ হিজরাত সংঘটিত হয়।[৪৬২]

---

[৪৫৮] প্রাগুক্ত

[৪৫৯] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

[৪৬০] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৮২

[৪৬১] *আল-ইসতি'য়াব*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৯০৭

[৪৬২] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) চাচী উম্মুল ফাদল (রা.)কে অনেক ভালোবাসতেন। রাসূল (স.) প্রায়ই তাঁকে দেখার জন্য তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন।[৪৬৩]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) অত্যন্ত সাহসী ও মর্যাদাসম্পন্ন নারী ছিলেন। একবার তিনি লাঠি দিয়ে ইসলামের চরম শত্রু আবু লাহাবকে এতো জোরে মারলেন যে, তার মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বইতে লাগলো।[৪৬৪]

রাসূল (স.)কে তিনি সীমাহীন ভালোবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর রাসূল (স.) একমাত্র হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) ব্যতিত আর কোনো মহিলার কোলে মাথা রাখেননি এবং তা তাঁর জন্য বৈধও ছিলো না। হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) রাসূল (স.)-এর পবিত্র মাথা নিজের কোলের উপর রেখে চুল থেকে ময়লা দূর করে দিতেন এবং মাথা চিরুনী করে দিতেন।[৪৬৫]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) অত্যন্ত পরহেযগার আবিদা ছিলেন। তিনি প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার আবশ্যিকভাবে রোযা রাখতেন।[৪৬৬] তিনি বিদায় হাজ্জে রাসূল (স.)-এর সঙ্গে হাজ্জ আদায় করেন। আরাফাতের দিন রাসূল (স.) রোযা আছেন কিনা, এ ব্যাপারে সাহাবীরা দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে ছিলেন। একথা উম্মুল ফাদল (রা.) জানতে পেরে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য এক পেয়ালা দুধ রাসূল (স.)-এর খিদমতে প্রেরণ করলেন। রাসূল (স.) সেই দুধ পান করেন। এতে সাহাবীদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়।[৪৬৭]

একদা উম্মুল ফাদল (রা.) স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল (স.)-এর পবিত্র শরীরের কোনো অংশবিশেষ তাঁর ঘরে রয়েছে। তিনি এ স্বপ্নের কথা রাসূল (স.)-এর কাছে বর্ণনা

---

[৪৬৩] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫৩৯
[৪৬৪] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত
[৪৬৫] প্রাগুক্ত
[৪৬৬] প্রাগুক্ত
[৪৬৭] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৭৯

Dhaka University Institutional Repository

করলেন। রাসূল (স.) বললেন– এই স্বপ্নের তাবীর হলো, আল্লাহ তাআলা ফাতিমা (রা.)কে পুত্র দান করবেন। আর তুমি তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করাবে। কিছুদিন পর ফাতিমা (রা.)-এর পুত্র হোসাইন জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করান এবং প্রতিপালন করেন।[৪৬৮]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা.)-এর গর্ভে ৭টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ৬টি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান। পুত্ররা হলেন– ফাদল, আবদুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, মা'বাদ, কুসাম, আবদুর রহমান। কন্যার নাম ছিল উম্মু হাবীবা। আরব কবি আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আল-হিলালী বলেছেন– 'উম্মুল ফাদলের গর্ভের ছয় সন্তানের মতো কোনো সন্তান আরবের কোনো নারী প্রসব করেননি।'[৪৬৯]

হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) রাসূল (স.) হতে ৩০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যৌথভাবে ১টি হাদীস সংকলন করেছেন। আর ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র.) এককভাবে ৩টি হাদীস সংকলন করেছেন।[৪৭০] হযরত উম্মুল ফাদল (রা.) থেকে যেসব বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে– হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, তাম্মাম, আনাস ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন হারিস, কুরাইব মাওলা ইব্ন আব্বাস, উমাইর ও ফাবুস প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৭১]

তিনি তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর স্বামী হযরত আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) তখনও জীবিত ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৪৭২]

---

[৪৬৮] প্রাগুক্ত
[৪৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭
[৪৭০] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৫
[৪৭১] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৬
[৪৭২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু সুলাইম বিন্ত মিলহান (রা.)

ডাক নাম উম্মু সুলাইম ও উম্মু আনাস। প্রকৃত নাম নিয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য বিদ্যমান। যথা– সাহলাহ, রমীলাহ, মুলাইকা, রামীসাহ, আনীফাহ। তিনি উম্মু সুলাইম নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর বংশধারা হলো– উম্মু সুলাইম বিন্ত মিলহান ইব্ন খালিদ ইব্ন হারাম ইব্ন জুন্দুব ইব্ন আমের ইব্ন গানাম ইব্ন আদী ইব্ন নাজ্জার। মায়ের নাম মালিকাহ। যিনি মালিক ইব্ন আদীর কন্যা ছিলেন।[৪৭৩] হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) প্রখ্যাত সাহাবী ও রাসূল (স.)-এর অতি স্নেহের খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর গর্বিতা মা। ঐতিহাসিক বীরে মা'উনার ঘটনায় শাহাদাত প্রাপ্ত অন্যতম সাহাবী হযরত হারাম ইব্ন মিলহান (রা.) তাঁর ভাই।[৪৭৪]

জাহিলী যুগে সগোত্রীয় মালিক ইব্ন নাদারকে বিয়ে করেন। রাসূল (স.)-এর হিজরাতের ১০ বছর পূর্বে পুত্র আনাস ইব্ন মালিক জন্মগ্রহণ করেন। আনসারদের মধ্যে যারা প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমান হন উম্মু সুলাইম (রা.) তাঁদের অন্যতম। তিনি মুসলমান হলে তাঁর স্বামী মালিক সম্পর্ক ছিন্ন করে সিরিয়ায় চলে যায় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৪৭৫] এর কিছুদিন পর চারদিক হতে বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হলো। কিন্তু পুত্র আনাস বড় না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন, হযরত আনাস (রা.)-এর যখন কিছুটা বুদ্ধি হলো তখন তাঁর গোত্রের আবূ তালহা তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। আবূ তালহা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং কাঠের একটি মূর্তির পূজা করতেন। উম্মু সুলাইম তাঁকে বললেন– তুমি কি জানো না যে, তুমি যার ইবাদাত করো তা হলো কাঠের মূর্তি? সে বললো– হ্যাঁ! উম্মু সুলাইম (রা.) বললেন– 'কাঠের পূজা করতে তোমার লজ্জা হয় না? তুমি ইসলাম কবুল করলে তোমার সাথে বিয়েতে আমার আপত্তি থাকবে না। আর সেক্ষেত্রে

---

[৪৭৩] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯
[৪৭৪] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫০৪
[৪৭৫] *আল ইসাবা*, *প্রাগুক্ত*, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

তোমার ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মাহরের দাবিও আমার থাকবে না।' সে চিন্তা করতে করতে চলে গেলো। কিছুদিন পর উম্মু সুলাইম (রা.)-এর নিকট এসে বললো– 'আমার উপর সত্য সমুদ্ভাসিত হয়েছে এবং এখন আমি তোমার দ্বীন কবুল করার জন্য প্রস্তুত।' অত:পর হযরত আনাস (রা.)-এর ব্যবস্থাপনায় তাঁদের বিয়ে কার্য সম্পন্ন হয়।[৪৭৬]

রাসূল (স.) মদীনায় হিজরাত করে আসলে হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) পুত্র হযরত আনাস (রা.)কে সঙ্গে করে রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বলেন– 'আমার পুত্র আনাসকে আপনার সেবায় নিয়োজিত করলাম, তাঁর জন্য দু'আ করুন।' রাসূল (স.) তাঁর জন্য দু'আ করলেন। আনাস (রা.) তখন ১০ বছরের বালক। তখন থেকে রাসূল (স.)-এর ওফাত পর্যন্ত আনাস (রা.) তাঁর খিদমাত করেন এবং 'খাদিমুন নাবী' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।[৪৭৭]

হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) ইসলামের জন্য একজন নিবেদিত প্রাণ মহিলা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বড় বড় যুদ্ধে রাসূল (স.)-এর সাথে অংশ নিতেন। রাসূল (স.) বিভিন্ন যুদ্ধে উম্মু সুলাইম (রা.) ও অন্য কতিপয় আনসারী মহিলাকে নিয়ে যেতেন। তাঁরা মুজাহিদদের পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা করতেন।[৪৭৮]

৩য় হিজরীতে হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) স্বামী আবূ তালহা (রা.)-এর সঙ্গে উহুদের যুদ্ধে অংশ নেন। এ যুদ্ধে হযরত আবূ তালহা (রা.) সেই মুষ্টিমেয় মুজাহিদদের অন্যতম যাঁরা শেষ পর্যন্ত রাসূল (স.)কে রক্ষার জন্য নিজের বুক পেতে দিয়েছিলেন। এ সময় হযরত আয়িশা (রা.) ও হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) মশ্‌ক ভরে ভরে যুদ্ধের ময়দানে পানি আনতেন এবং আহতদেরকে পানি পান করাতেন।[৪৭৯]

---

[৪৭৬] প্রাগুক্ত

[৪৭৭] প্রাগুক্ত

[৪৭৮] *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯২-৫৯৩

[৪৭৯] *সহীহ আল-বুখারী*, প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৮১

Dhaka University Institutional Repository

৭ম হিজরীতে খাইবার যুদ্ধেও তিনি যোগদান করেন। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পর হুনাইনের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধেও হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) অংশগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবী তালহা তখন তাঁর গর্ভে। তা সত্ত্বেও তিনি খঞ্জর হাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আবূ তালহা (রা.) রাসূল (স.)কে গিয়ে এ সংবাদ অবহিত করলে তিনি উম্মু সুলাইম (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন– খঞ্জর দিয়ে কি করবে? তিনি বললেন– কোনো মুশরিক নিকটে এলে আমি তার পেট ফেঁড়ে ফেলবো, একথা শুনে রাসূল (স.) মৃদু হেসে দেন।[৪৮০]

হিজরাতের কয়েক মাস পর রাসূল (স.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। এসময় হযরত উম্মু সুলাইম (রা.)-এর গৃহেই রাসূল (স.) এবং আনসার ও মুহাজিরদের বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।[৪৮১]

হযরত উম্মু সুলাইম (রা.)-এর সম্মান ও মর্যাদা অনেক বেশি। নবী কারীম (স.) ইরশাদ করেন– আমি জান্নাতে যেয়ে এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম– এ নারী কে? আমাকে জানানো হলো– আনাসের মা গামীসাহ বিন্ত মিলহান।[৪৮২]

হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও প্রজ্ঞা সম্পন্না মহিলা। তিনি রাসূল (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে মোট ১৪ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যৌথভাবে ১ টি হাদীস, ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ১ টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (র.) এককভাবে ২ টি হাদীস সংকলন করেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– আনাস ইব্ন মালিক,

---

৪৮০ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯৭

৪৮১ *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২

৪৮২ *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৩

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস, যায়িদ ইব্ন সাবিত, আবূ সালামা ইব্ন আবদির রহমান প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৮৩]

হযরত উম্মু সুলাইম (রা.)-এর ইন্তিকালের সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

হযরত উম্মু হারাম বিন্ত মিলহান (রা.)

ডাক নাম উম্মু হারাম। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁর আসল নাম জানা যায় না। তাঁর বংশধারা হলো– উম্মু হারাম বিন্ত মিল্হান ইব্ন খালিদ ইব্ন যায়িদ ইব্ন হারাম ইব্ন জুন্দুব ইব্ন আমের ইব্ন গানাম ইব্ন আদী ইব্ন নযর। তাঁর মায়ের নাম মালিকা। উম্মু হারাম (রা.) মদীনার বিখ্যাত খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা। মায়ের দিক দিয়ে তিনি হযরত উম্মু সুলাইম (রা.)-এর বোন এবং হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর খালা। আর দুগ্ধপানের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর খালা।[৪৮৪]

উম্মু হারাম (রা.) তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে প্রথম দিকে মদীনায় ইসলাম কবুল করেন। ইব্ন হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, হযরত উম্মু হারাম (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয় আমর ইব্ন কায়িস আল-আনসারীর সাথে।[৪৮৫] তবে ইব্ন সা'দের ধারণা, উবাদা ইব্ন সামিত (রা.) তাঁর প্রথম স্বামী এবং তাঁর দ্বিতীয় স্বামী আমর ইব্ন কায়িস।[৪৮৬]

---

[৪৮৩] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৪৩
[৪৮৪] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৬
[৪৮৫] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৮৯
[৪৮৬] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) উম্মু হারাম (রা.)কে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। মাঝে মাঝে তাঁর গৃহে যেতেন এবং দুপুরে বিশ্রাম নিতেন। একবার রাসূল (স.) উম্মু হারাম (রা.)-এর গৃহে এলেন, তখন তিনি রাসূল (স.)কে খাবার তৈরি করে খাওয়ান। আহার শেষে রাসূল (স.) বিশ্রাম নিতে থাকেন। আর হযরত উম্মু হারাম (রা.) রাসূল (স.)-এর মাথার চুল বিলি দিয়ে উকুন দেখতে থাকেন। এমতাবস্থায় রাসূল (স.) তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর জেগে উঠে মৃদু হেসে উম্মু হারাম (রা.)কে শাহাদাতের সুসংবাদ দান করেন। আর সেদিন থেকেই তাঁকে 'আশ্-শাহীদা' বলা হতে থাকে। রাসূল (স.)-এর এই সুসংবাদ হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফাতকালে বাস্তবায়ন হয়। ২৭ হিজরীতে খলীফার নির্দেশে সাগর দ্বীপ কুবরস (সাইপ্রাস) জয় করার জন্য হযরত মু'আবিয়া (রা.) একটি নৌ-বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে হযরত আবূ যার গিফারী (রা.), আবূ দারদা (রা.), উবাদা ইব্ন সামিত (রা.)-এর মতো অনেক উঁচু স্তরের সাহাবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হযরত উম্মু হারাম (রা.)ও স্বামী উবাদা ইব্ন সামিত (রা.)-এর সঙ্গে এ অভিযানে যোগ দেন। তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী কুবরস অবতরণ করে এবং রোমান বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ইসলামী পতাকা উড্ডীন করে। কুবরস বিজয় শেষে ফেরার পথে উম্মু হারাম (রা.) বাহন পশুর পিঠে চড়তে গিয়ে পড়ে যান এবং ভীষণ আঘাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাগর দ্বীপ কুবরসের মাটিতেই তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৮৭] মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র সন্তান রেখে যান। প্রথম স্বামীর ঔরসজাত কায়িস ও আবদুল্লাহ এবং দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত মুহাম্মদ।[৪৮৮]

হযরত উম্মু হারাম (রা.) রাসূল (স.) থেকে মোট ৫ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেন, তাদের মধ্যে– হযরত আনাস ইব্ন মালিক, আমর ইব্ন আসওয়াদ, উবাদা ইব্ন সামিত এবং আতা ইব্ন ইয়াসার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৪৮৯]

---

৪৮৭ *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪২৩

৪৮৮ *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩১৮

৪৮৯ *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হযরত সুমাইয়া বিন্‌ত খুব্‌বাত (রা.)

নাম সুমাইয়া। পিতার নাম খুব্‌বাত[৪৯০] কিংবা খায়্যাত।[৪৯১] তিনি ইসলামের প্রথম শহীদ। প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের মা এবং মক্কার আবূ হুযাইফা ইব্‌ন মুগীরা আল-মাখযুমীর দাসী।[৪৯২]

হযরত আম্মার (রা.)-এর পিতা ইয়াসির ইয়ামানের মাজহাজ গোত্রের সন্তান। ইয়াসির ইব্‌ন আমের নিখোজ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কা এসে উপস্থিত হয় এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে আবূ হুযাইফা ইব্‌ন মুগীরার মিত্র হয়ে যায়। আবূ হুযাইফা তার দাসী সুমাইয়াকে ইয়াসিরের সঙ্গে বিয়ে দেন। তাঁর ঔরসেই হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর দুই পুত্র জন্ম লাভ করে। তাঁরা হলো আবদুল্লাহ ও আম্মার (রা.)।

হযরত সুমাইয়া (রা.) যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন রাসূল (স.) নবুওয়্যাত প্রাপ্ত হন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই স্বামী ইয়াসির ও পুত্র আম্মারসহ গোপনে ইসলাম কবুল করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দেন। এর ফলে কুরাইশরা তাঁদের উপর প্রচুর নির্যাতন চালাতে থাকে। হযরত ইয়াসির (রা.) ছিলেন বিদেশী এবং হযরত সুমাইয়া (রা.) ছিলেন দাসী। কুরাইশরা এই অসহায় পরিবারের উপর এমন এমন নির্যাতন চালালো যে মানবতা ভুলণ্ঠিত হলো। একদিন মুশরিকরা যখন আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গকে শাস্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূল (স.) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের অবস্থা দেখে খুবই ব্যথিত হলেন এবং বললেন 'হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ! ধৈর্যধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।'[৪৯৩]

---

৪৯০ *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৮
৪৯১ *আনসাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৭
৪৯২ *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত
৪৯৩ *হায়াতুস সাহাবা*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইয়াসির (রা.) ও হযরত সুমাইয়া (রা.) উভয়েই ছিলেন বার্ধক্য প্রপীড়িত। কিন্তু তাঁদের ঈমানী দৃঢ়তা ছিল পাহাড়ের মতো। মুশরিকরা তাঁদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন চালাতো এবং শির্কের পথে ফিরে আসতে আহবান করতো। কিন্তু তাঁদের পা মুহূর্তের জন্যও তাওহীদ হতে বিচ্যুত হয়নি। লোহার যিরাহ বা বর্ম পরিয়ে মক্কার উত্তপ্ত বালির উপর শুইয়ে দেয়া, তাঁদের পিঠে আগুন দিয়ে দাগ দেয়া এবং পানিতে ডুবিয়ে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হতো।[৪৯৪] সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা মুক্তি পেতেন। একদিন হযরত সুমাইয়া (রা.) দিনভর নির্যাতন সহ্য করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এলে আবূ জাহ্‌ল তাঁকে অশালীন ভাষায় গালি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁর পশুত্বের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে এবং সেটি তাঁর যৌনাঙ্গে গিয়ে বিদ্ধ হয়। তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৪৯৫] হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরাতের কয়েক বছর আগে সংঘটিত হয়। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ।

---

[৪৯৪] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

[৪৯৫] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উম্মু রূমান বিন্‌ত আমের (রা.)

আসল নাম যায়নাব মতান্তরে দা'আদ।[৪৯৬] ডাক নাম- উম্মু রূমান। এ নামেই তিনি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁর বংশধারা হলো– উম্মু রূমান বিন্‌ত আমের ইব্‌ন উয়াইমির ইব্‌ন আবদি শাম্‌স ইব্‌ন ইতাব ইব্‌ন উযাইনা ইব্‌ন সাবি ইব্‌ন দাহ্‌মান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন গানাম ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিনানাহ।[৪৯৭]

হযরত উম্মু রূমান (রা.) ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা.)-এর মাতা। তাঁর প্রথম স্বামী আবদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস জাহিলী যুগে মক্কায় এসে হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। তুফাইল নামে এক পুত্র সন্তান রেখে তিনি মারা যান। বিধবা উম্মু রূমান (রা.) তাঁর ছেলেসহ দারুন অসহায় অবস্থায় পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর (রা.) উম্মু রূমান (রা.)কে বিয়ে করেন। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ঔরসে উম্মু রূমান (রা.)-এর গর্ভে হযরত আয়িশা (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন।[৪৯৮] ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা উভয়ই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত।

রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত আবূ বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উম্মু রূমান (রা.) স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কথা জেনেই নিশ্চিন্তে তাঁকে অনুসরণ করেন এবং এভাবেই ইসলামের একেবারে সূচনা পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী দলের সদস্য হওয়ার অনন্য গৌরবের অধিকারী হন।[৪৯৯]

---

[৪৯৬] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪৩৩

[৪৯৭] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৪৯৮] *নিসা আসর আন-নবুবিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯-২৭০

[৪৯৯] *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.) হিজরাত করে মদীনায় যাওয়ার কিছুদিন পর মক্কা থেকে পরিবার-পরিজনকে মদীনায় নেওয়ার জন্য যায়িদ ইব্ন হারিসা (রা.) ও আবূ রাফে (রা.)কে মক্কায় পাঠান। হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁদের সাথে আবদুল্লাহ ইব্ন আরীকাতকে ২/৩ টি উট দিয়ে পাঠান। তিনি মক্কায় অবস্থানরত পুত্র আবদুল্লাহকে বলে পাঠান যে, সে যেন আসমা, আয়িশা ও তাঁদের মা উম্মু রূমানকে নিয়ে মদীনায় চলে আসে। আবদুল্লাহ পিতার নির্দেশ মতো উম্মু রূমান, আসমা ও আয়িশা (রা.)কে নিয়ে মদীনায় গমন করেন।[৫০০]

হযরত উম্মু রূমান (রা.) একজন ধর্মপরায়ণ মহিলা ছিলেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। স্বামীর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁকে ইসলামের সেবায় আরো বেশি সময় দানের সুযোগ করে দিতেন। তিনি স্বামী আবূ বকর (রা.)কে দুর্বল শ্রেণীর মুসলমানদের পাশে দাঁড়াতে এবং নিজের অর্থে দাসদের ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে দেখে আনন্দিত হতেন। তাঁর মহৎ কাজে তিনি উৎসাহ দিতেন।[৫০১]

হযরত উম্মু রূমান (রা.) রাসূল (স.) থেকে ১ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র.) হাদীসটি সংকলন করেন।[৫০২]

তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহাজ্জ মাসে মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৫০৩] তাঁর দাফনের জন্য রাসূল (স.) স্বয়ং কবরে নামেন এবং তাঁর জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূল (স.) তাঁর লাশ কবরে নামানোর সময় উপস্থিত লোকদের লক্ষ্য করে বলেন– 'তোমাদের কেউ যদি জান্নাতের হুরে আইন

---

[৫০০] *আন্‌সাবুল আশ্‌রাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৯-২৭০

[৫০১] *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২৩৮, ৪৪৩

[৫০২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

[৫০৩] *আ'লাম আন্-নিসা*, ওমার রিদা কাহ্‌হাল, মুয়াস্‌সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৪, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭২

Dhaka University Institutional Repository

দেখে খুশি হতে চায় সে উম্মু রূমানকে দেখতে পারে।'[৫০৪] বস্তুত রাসূল (স.)-এর এ বাণীতে উম্মু রূমান (রা.)-এর জান্নাতি হবার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত শিফা বিন্ত আবদিল্লাহ (রা.)

নাম শিফা মতান্তরে লায়লা। ডাক নাম উম্মু সুলাইমান। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের আদী গোত্রের কন্যা। তাঁর বংশধারা হলো– শিফা বিন্ত আবদিল্লাহ ইব্ন আব্দি শাম্স ইব্ন খালফ ইব্ন শাদ্দাদ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন কুরত ইব্ন রাযাহ ইব্ন আদী ইব্ন কা'ব ইব্ন লুব্বী।[৫০৫] মাতার নাম ফাতিমা বিন্ত আবী ওয়াহাব।[৫০৬]

আবূ হুস্মা ইব্ন হুযাইফা আল-আদাবীর সাথে হযরত শিফা বিন্ত আবদিল্লাহ (রা.)-এর বিয়ে হয়।[৫০৭] হিজরাতের পূর্বে মক্কাতেই ইসলাম কবুল করেন এবং প্রথম পর্বে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাতকারী মহিলাদের মধ্যে তিনিও একজন।[৫০৮]

কুরাইশের যে ক'জন মহিলা লেখা-পড়া জানতেন, হযরত শিফা (রা.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কয়েক ধরণের রোগী তাঁর নিকট আসতো এবং তিনি ঝাড়-ফুঁক দিয়ে তাদের চিকিৎসা করতেন। তাঁর পিঁপড়ায় কামড়ানোর মন্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি রাসূল (স.)-এর নির্দেশে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.)কে লেখা শিখিয়েছিলেন।[৫০৯]

---

[৫০৪] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৭৭
[৫০৫] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৫৭
[৫০৬] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৮৬
[৫০৭] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৮
[৫০৮] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩৩
[৫০৯] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শিফা (রা.) রাসূল (স.)কে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। রাসূল (স.)ও তাঁর এ মহব্বতের অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে শিফা (রা.)-এর গৃহে যেতেন এবং বিশ্রাম নিতেন। হযরত শিফা (রা.) তাঁর গৃহে রাসূল (স.)-এর জন্য একটি বিছানা ও একটি পরিধেয় বস্ত্র বিশেষভাবে রেখে দিতেন। রাসূল (স.) তা ব্যবহার করতেন।[৫১০] রাসূল (স.) হিজরাতের কিছুদিন পর হযরত শিফা (রা.)কে একটি বাড়ি দান করেন। সেই বাড়িতে তিনি পুত্র সুলাইমানকে নিয়ে বসবাস করতেন।[৫১১]

হযরত শিফা (রা.) রাসূল (স.) থেকে সরাসরি এবং হযরত ওমার (রা.) থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১২ টি।[৫১২] তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– তাঁর পুত্র সুলাইমান, পৌত্র আবূ বকর ও উসমান এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫১৩]

তিনি হযরত ওমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে ২০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে ইন্তিকাল করেন।[৫১৪]

---

[৫১০] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত
[৫১১] *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
[৫১২] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত
[৫১৩] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪২৮
[৫১৪] *আ'লাম আন্-নিসা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস (রা.)

নাম ফাতিমা। পিতা কায়িস। তাঁর বংশধারা হলো– ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন ওয়াহাব ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন ওয়ায়িলা ইব্‌ন আমর ইব্‌ন শায়বান ইব্‌ন মাহারিব ইব্‌ন ফাহর। মায়ের নাম উমাইমা বিন্‌ত রাবিয়্যা।[৫১৫] দাহ্‌হাক ছিলেন ফাতিমা (রা.)-এর ভাই। ফাতিমা (রা.) দাহ্‌হাকের চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন।[৫১৬]

আবূ আমর ইব্‌ন হাফসের সাথে হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস (রা.)-এর বিয়ে হয়। মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হিজরাতের প্রথম দিকেই অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন।[৫১৭]

দশম হিজরীতে হযরত আলী (রা.) রাসূল (স.)-এর নির্দেশে একটি বাহিনী নিয়ে ইয়ামান রওয়ানা হন। এ বাহিনীতে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর স্বামী হযরত আবূ আমর ইব্‌ন হাফ্‌সও ছিলেন। রওয়ানার আগে তিনি বিয়ের উকীল আয়াশ ইব্‌ন রাবীআ (রা.)-এর মাধ্যমে স্ত্রী ফাতিমা (রা.)কে শেষ তালাক দিয়ে যান। ইতিপূর্বে তিনি পর পর দু'তালাক দিয়েছিলেন। এরপর হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূল (স.)-এর নির্দেশে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উম্মু মাকতুম (রা.)-এর গৃহে ইদ্দাত পালন করেন। ইদ্দাত শেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন দিক থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফিয়ান, হযরত আবূ জাহম ইব্‌ন হুযাইফা এবং হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদও হযরত ফাতিমা (রা.)কে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) এ ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। রাসূল (স.) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা.)কে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর ধারণা ছিল রাসূল (স.) তাঁকে বিয়ে করবেন, এ জন্য তিনি এ প্রস্তাবে ইতস্তত

---

[৫১৫] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

[৫১৬] *তাহযীবুত তাহযীব*, প্রাগুক্ত, ১২শ খন্ড, পৃ. ৪৭১

[৫১৭] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫২৬

Dhaka University Institutional Repository

করতে থাকেন। রাসূল (স.) বললেন, আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করো, তাতেই তোমার কল্যাণ নিহিত। এরপর হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.)কে বিয়ে করেন। পরবর্তীকালে হযরত ফাতিমা (রা.) বলতেন– 'হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.)-এর সঙ্গে বিয়ের পর আমি লোকদের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হই।'[৫১৮]

২৩ হিজরীতে খলীফা হযরত ওমার (রা.) ইনতিকাল করার পর মজলিসে শূরার বৈঠক হযরত ফাতিমা (রা.)-এর গৃহেই অনুষ্ঠিত হতো। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধী শক্তি সম্পন্ন একজন বিশিষ্ট নারী সাহাবী। এজন্য মজলিসে শূরার সদস্যগণ তাঁর পরামর্শ গ্রহণ প্রয়োজন মনে করতেন।[৫১৯]

৫৪ হিজরীতে তাঁর স্বামী হযরত উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) ইন্তিকাল করেন। স্বামীর ইনতিকালে ফাতিমা (রা.) বেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। বিধবা হিসেবে বাকী জীবন ভাই দাহহাক ইব্ন কায়িস (রা.)-এর সংসারে কাটিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে ইয়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা.) তাঁর শাসনকালে দাহহাক ইব্ন কায়িসকে ইরাকের গভর্নর নিয়োগ করলে ফাতিমা (রা.) তাঁর সাথে কুফায় চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।[৫২০]

হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়িস (রা.) রাসূল (স.) থেকে ৩৪ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, আবূ সালামা, আবূ বকর ইব্ন আবী জাহ্ম, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, উরওয়া ইব্ন যুবাইর, সালমান ইব্ন ইয়াসার এবং শা'বী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।[৫২১]

---

[৫১৮] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪১১-৪১৪
[৫১৯] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত
[৫২০] প্রাগুক্ত
[৫২১] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত কায়িস (রা.)-এর ইনতিকাল সন সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এতটুকু জানা যায় যে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইর (রা.)-এর খিলাফাতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৫২২]

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত খাত্তাব (রা.)

নাম ফাতিমা। ডাক নাম উম্মু জামীল। পিতা খাত্তাব ইব্‌ন নুফাইল। মাতা হান্‌তামা বিন্‌ত হাশিম ইব্‌ন মুগীরা। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর পিতা খাত্তাব ছিলেন কুরাইশ গোত্রের আদীবা শাখার সন্তান এবং মাতা হান্‌তামা ছিলেন কুরাইশ গোত্রের মাখযুমী শাখার কন্যা।[৫২৩] হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন হযরত ওমার ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর সহোদরা এবং হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.)-এর স্ত্রী, মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক পর্বে হাতে গোনা যে কতিপয় নারী-পুরুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন হযরত ফাতিমা (রা.) ও তাঁর স্বামী হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়িদ (রা.) তাঁদের অন্যতম।[৫২৪]

জাহিলী যুগেই মক্কার কুরাইশ গোত্রের সাঈদ ইব্‌ন যায়িদের সাথে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর বিয়ে হয়। সাঈদ মদীনায় হিজরাত করেন এবং বদরসহ সকল যুদ্ধে রাসূল (স.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি ছিলেন রাসূল (স.) কর্তৃক জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান দশজন সাহাবীর অন্যতম। ৫১ হিজরীতে তিনি মদীনায় ইন্‌তিকাল করেন।[৫২৫]

মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। হযরত ওমার (রা.)ও ইসলাম গ্রহণের কারণে বোন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর উপর অত্যাচার চালান। কিন্তু তাঁর

---

[৫২২] প্রাগুক্ত

[৫২৩] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৬৭

[৫২৪] প্রাগুক্ত

[৫২৫] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

বোন ফাতিমা (রা.) তাঁর মধ্যে অনুশোচনার সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে ইসলামের দিকে টেনে আনেন।

রুক্ষ মেজাজ ও রাসূল (স.)-এর প্রতি চরম শত্রুতার জন্য হযরত ওমার (রা.)-এর খ্যাতি ছিল। একদিন তিনি রাসূল (স.)কে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারী নিয়ে বের হলেন। পথে নু'আইম ইব্ন আবদিল্লাহর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওমার! কোন দিকে যাচ্ছ? ওমার উত্তরে বললেন, মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। নু'আইম বললেন, আমি কি তোমাকে অবাক হবার মতো একটি সংবাদ শোনাবো? তোমার বোন ও ভগ্নিপতি দু'জনই ইসলাম গ্রহণ করেছে। হযরত ওমার (রা.) একথা শুনে রাগে ক্ষোভে উত্তেজিত অবস্থায় বোন-ভগ্নিপতির বাড়ির পথ ধরেন। তাঁদের বাড়িতে তখন হযরত খাব্বাব ইব্ন আরাত (রা.) তাঁদের দু'জনকে 'সূরা ত্বহা' শেখাচ্ছিলেন। তাঁরা হযরত ওমার (রা.)-এর উপস্থিতি টের পেলেন। হযরত খাব্বাব (রা.) বাড়ির এক কোনে আত্মগোপন করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) সূরা ত্বহা লিখিত পৃষ্ঠাটি লুকিয়ে ফেলেন। হযরত খাব্বাব (রা.) যে তাঁদেরকে কুরআন শেখাচ্ছিলেন, ওমার (রা.) তা বাড়ির কাছাকাছি এসে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি ঘরে প্রবেশ করেই প্রশ্ন করেন– তোমাদের এখানে যে গুনগুন আওয়াজ শুনতে পেলাম তা কিসের? তাঁরা বললেন– আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। ওমার (রা.) বললেন– আমি জেনেছি তোমরা মুহাম্মদ (স.)-এর ধর্মের অনুসারী হয়েছো। তারপর তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ (রা.)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং কিল-ঘুষি মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়ে দু'পায়ে দলতে লাগলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) তাঁর স্বামীর উপর চড়ে বসা ওমারকে সরিয়ে দিলেন। কিন্তু ওমার (রা.) ফাতিমার মুখে এমন এক ঘুষি মারেন যে, তাঁর মুখটি রক্তে ভিজে যায়। এ অবস্থায় ফাতিমা (রা.) বললেন– আমি তো ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি। এখন তোমার ভয়ে এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বোনের রক্তভেজা মুখ দেখে হযরত ওমার (রা.) আৎকে উঠলেন। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন। তিনি বললেন– ঠিক আছে, তোমরা যে পৃষ্ঠাটি পাঠ করছিলে সেটা আমাকে দাও, আমি পড়ে দেখি। হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন– তুমি তো একজন অপবিত্র মানুষ। আর এটা পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। তুমি গোসল করে এসো। হযরত ওমার (রা.) উঠে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে এসে পৃষ্ঠাটি নিয়ে সূরা ত্বহার ১-১৪ আয়াত পাঠ করলেন। এরপর তিনি উৎফুল্ল চিত্তে বলে উঠেন– এতো অতি চমৎকার মহিমান্বিত কথা! মুহাম্মদ (স.) কোথায়, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। হযরত ওমার (রা.)-এর একথা শুনে হযরত খাব্বাব (রা.) কাছে ছুটে আসলেন এবং বললেন– ওমার! তোমার জন্য সুসংবাদ। রাসূল (স.) এখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা.)-এর গৃহে আছেন। অত:পর হযরত ওমার (রা.) সাফা পাহাড়ের সন্নিকটে হযরত আরকাম (রা.)-এর গৃহে পৌঁছে রাসূল (স.)-এর সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[৫২৬]

হযরত ফাতিমা (রা.) ভাইকে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসতে পারায় খুব খুশি হলেন। তিনি স্বামী হযরত সাঈদ ইব্ন যায়িদ (রা.)-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন। সেখানে অন্যান্য নারী সাহাবীদের সাথে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূল (স.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় না। হাদীসের সহীহ গ্রন্থসমূহে তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীস পরিলক্ষিত হয় না।[৫২৭]

হযরত ওমার (রা.)-এর খিলাফাতকালে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি চার পুত্র সন্তান রেখে যান। হযরত ফাতিমা (রা.) ছিলেন একজন সুসাহিত্যিক, বিদূষী ও বুদ্ধিমতি সাহাবী।[৫২৮]

---

[৫২৬] *সীরাতু ইব্ন হিশাম*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৩-৩৪৫

[৫২৭] *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

[৫২৮] *আদ্-দুররুল মানসুর*, আস-সুয়ূতী, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, পৃ. ৩৬৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.)

নাম ফাতিমা। পিতার নাম আসাদ। পিতামহ হাশিম, প্রপিতামহ আবদি মান্নাফ ইব্‌ন কুসাই। পিতামহ হাশিমে গিয়ে তাঁর বংশধারা রাসূল (স.)-এর বংশধারার সাথে মিলিত হয়েছে। রাসূল (স.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন একদিকে তাঁর শ্বশুর এবং অন্যদিকে চাচা।[৫২৯] হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.) রাসূল (স.)-এর চাচা আবূ তালিবের স্ত্রী, মূতার যুদ্ধের শহীদ হযরত জাফর তাইয়্যার (রা.) এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা.)-এর গর্বিতা মা, খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা জোহরা (রা.)-এর শাশুড়ি এবং জান্নাতের অধিকারী যুবকদের দু'নেতা হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর দাদী।[৫৩০]

উম্মাতে মুসলিমা হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.)কে নিয়ে গৌরব করে থাকেন। রাসূল (স.)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তিনি রাসূল (স.)কে লালন-পালনের সুযোগ লাভে ধন্য হন। তিনি রাসূল (স.)-এর প্রতি খুব যত্নবান ছিলেন। এ কারণে রাসূল (স.) সারা জীবন চাচী হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.)কে গর্ভধারিণী মায়ের পরে দ্বিতীয় মা বলে মনে করতেন।[৫৩১]

রাসূল (স.) নবুওয়্যাত লাভের পর নিজ গোত্র ও আত্মীয়-স্বজনকে ইসলামের দিকে আহবান জানান। ইসলামের সেই প্রাথমিক পর্বে যে কজন নারী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন তাঁদের মধ্যে হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.) অন্যতম। সেই সময় তাঁর স্বামী আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণে অপারগ হলেও তিনি আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে সক্ষম হন।[৫৩২]

---

[৫২৯] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৮

[৫৩০] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৫৩১] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৬২

[৫৩২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল (স.)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর মুসলমানদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করলে রাসূল (স.) মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরাত করার অনুমতি দেন। কুরাইশদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের যে দলটি প্রথমে হাবশায় হিজরাত করেন তাঁর মধ্যে হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা.)-এর কলিজার টুকরা হযরত জাফর (রা.) ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিন্ত উমাইস (রা.)ও ছিলেন। হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা.) দু:খ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছিন্নতা সহ্য করেছিলেন।[৫৩৩]

৭ম হিজরীতে কুরাইশরা বানু হাশিম ও বানু আবদিল মুত্তালিবের নারী-পুরুষ ও শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সকলকে 'শি'আবে আবী তালিব' উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল। অন্যদের সাথে হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা.)ও এ অবরুদ্ধ জীবনের তিনটি বছর সীমাহীন ক্ষুধা ও অনাহারে দিন কাটান এবং গাছের লতা-পাতা খেয়ে কোনো রকমে জীবন রক্ষা করেন। এ সময় তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।[৫৩৪] কুরাইশদের যুল্‌ম-নির্যাতন যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে রাসূল (স.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মদীনায় হিজরাত করতে থাকেন। তখন হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা.)ও মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরাত করেন।[৫৩৫]

রাসূল (স.) হযরত ফাতিমা বিন্ত আসাদ (রা.)কে খুবই ভালোবাসতেন এবং ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে লালন-পালন, আদব-আখলাক শিক্ষাদান ও তাঁর সাথে সুন্দর আচরণের প্রতিদানে রাসূল (স.)ও তাঁর সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করতেন। রাসূল (স.) মাঝে মাঝে তাঁকে বিভিন্ন জিনিস উপহার-উপঢৌকন পাঠাতেন।[৫৩৬]

---

[৫৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪
[৫৩৪] প্রাগুক্ত
[৫৩৫] *আল-ইস্‌তি'য়াব*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৭০
[৫৩৬] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৬৫-১৬৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.) রাসূল (স.) থেকে ৪৬ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যৌথভাবে ১টি হাদীস সংকলন করেন।[৫৩৭]

হিজরাতের কয়েক বছর পর হযরত ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.) মদীনায় ইন্‌তিকাল করেন। রাসূল (স.) তাঁর ইন্তিকালের পরেও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা ভুলেননি। তিনি নিজের জামা দিয়ে ফাতিমা বিন্‌ত আসাদ (রা.)-এর কাফনের ব্যবস্থা করেছেন। দাফনের পূর্বে তাঁর কবরে নেমে তাঁর পাশে শুয়েছেন এবং তাঁর ভালো কাজের কথা উল্লেখ করে প্রশংসা করেছেন।[৫৩৮]

হযরত খাওলা বিন্‌ত হাকীম (রা.)

নাম খাওলা। ডাক নাম উম্মু শুরাইক। তিনি মক্কার বানু সুলাইম গোত্রের হাকীম ইব্‌ন উমাইয়ার কন্যা।[৫৩৯] তাঁর বংশধারা হলো– খাওলা বিন্‌ত হাকীম ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন হারিসা ইব্‌ন আওকাস ইব্‌ন মুররা ইব্‌ন হিলাল ইব্‌ন ফালিহ ইব্‌ন যাক্‌ওয়ান ইব্‌ন সালাবা ইব্‌ন বাহসা ইব্‌ন সুলাইম।[৫৪০] মায়ের নাম যাইফা বিন্‌ত আস। হযরত খাওলা (রা.) রাসূল (স.)-এর খালা সম্পর্কীয় ছিলেন।[৫৪১]

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উসমান ইব্‌ন মাজউন (রা.)-এর সাথে হযরত খাওলা (রা.)-এর বিয়ে হয়। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী একই সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবুওয়্যাতের ১৩ বছর পর স্বামী-স্ত্রী একই সঙ্গে মদীনায় হিজরাত করেন। হযরত উসমান

---

[৫৩৭] *আ'লাম আন্‌-নিসা*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৩
[৫৩৮] *উসুদুল গাবা*, প্রাগুক্ত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫১৭
[৫৩৯] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৫৮
[৫৪০] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮
[৫৪১] *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

ইব্ন মাযউন (রা.) অত্যন্ত আবিদ ছিলেন। দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত জেগে সালাত আদায় করতেন। তিনি বদর যুদ্ধের পর মদীনায় ইন্তিকাল করেন। রাসূল (স.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন করেন। হযরত উসমান ইব্ন মাযউন (রা.)-এর ইন্তিকালের পর হযরত খাওলা (রা.) আর বিয়ে করেননি। তিনি রাসূল (স.)-এর খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।[৫৪২] মক্কায় প্রত্যহ রাসূল (স.)-এর যাবতীয় সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ-খবর নিতেন। মদীনায় গিয়েও আমরণ এ কাজ অব্যাহত রাখেন।

রাসূল (স.)-এর জীবনের কয়েকটি বড় ঘটনার সাথে তাঁর সংশ্লিষ্টতা তাঁকে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর হযরত খাওলা (রা.)-এর ব্যবস্থাপনায়ই রাসূল (স.)-এর সাথে হযরত সাওদা বিন্ত যামআ (রা.) হযরত আয়িশা (রা.)-এর বিয়ের কার্যাবলী সম্পন্ন হয়।[৫৪৩]

হযরত খাওলা বিন্ত হাকীম (রা.) একজন সুভাষিণী নারী সাহাবী ছিলেন। বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথা বলতেন। তিনি কাব্যচর্চাও করতেন।[৫৪৪]

হযরত খাওলা (রা.) ছিলেন অত্যন্ত নেককার ও মর্যাদাশীল মহিলা। স্বামীর ন্যায় তিনিও দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। তিনি রাসূল (স.)-এর সাথে জিহাদে শরীক হবার গৌরব অর্জন করেন। তায়িফ অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।[৫৪৫]

---

[৫৪২] *সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৫৬

[৫৪৩] বিস্তারিত দ্রব: *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৩; *মুসনাদে আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ২১০; *আনসাবুল আশরাফ*, প্রাগুক্ত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৮; *হযরত মুহাম্মদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, শায়খুল হাদীস মাও: তফাজ্জল হোছাইন, সম্পাদনা– ড. এ. এইচ. এম মুজতবা হোছাইন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮, পৃ. ৯৬৬

[৫৪৪] *আসহাবে রাসূলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ১৯৭

[৫৪৫] *মুসনাদে ইমাম আহমাদ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩০৯; *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত খাওলা বিন্ত হাকীম (রা.) রাসূল (স.) হতে ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইব্ন মাজাহ এসব হাদীস সংকলন করেন। মুসনাদে আহমাদে তাঁর থেকে ৪টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে– হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস, সাঈদ ইব্ন মুসাইয়্যিব, বিশর ইব্ন সাঈদ, শাহর ইব্ন হাওশাব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৪৬]

তাঁর ইন্তিকালের সময়কাল সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায় না।

হযরত উম্মু শুরাইক দাওসিয়া (রা.)

নাম উম্মু শুরাইক। উপাধি দাওসিয়া। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন নারী সাহাবী। তিনি ছিলেন কুরাইশী মহিলা। দাউস গোত্রে বিবাহ হয়েছিল বলে তাঁকে দাউসিয়া বলা হয়। পরে আনসারদের মাঝে বিবাহ হয়েছিল বলে তাঁকে আনসারিয়াও বলা হয়।[৫৪৭] তিনি ছিলেন দুদান ইব্ন আউফ ইব্ন আমর ইব্ন খালিদ ইব্ন জুবাব ইব্ন হুয়াইর ইব্ন মু'আইয ইব্ন আমেরের কন্যা।[৫৪৮]

তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হয় যে, যে সত্য তিনি লাভ করেছেন তা অন্যদের সামনেও তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। কুরাইশ নারীদের কাছে গিয়ে তিনি গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। মক্কায় কুরাইশরা তা জানতে পেরে তাঁকে ধরে তাঁর গোত্রের লোকদের হাতে তুলে দেয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে তিনদিন রোদে আটকিয়ে রাখে। খাবার-দাবার থেকেও তাঁকে

---

[৫৪৬] *নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০
[৫৪৭] *আল-ইসাবা*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ২৪৯
[৫৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত রাখে। তিনি যখন সূর্য্যের উত্তাপে জ্বলছেন, তখন তাঁকে রুটির সাথে মধু খেতে দিত। ফলে তাঁর শরীর খুবই গরম হতো। পানি পান করতে দিতো না। এ অবস্থায় যখন তিনদিন চলে যায় তখন জালিমরা বলল– 'যে দ্বীনের উপর তুমি আছ তা ত্যাগ কর।' কিন্তু এতো নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেননি।[৫৪৯]

তিনি হিজরাত করেন এবং মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। তাঁর মেহমানদারী ছিল প্রশংসনীয়। তিনি নিজের বাড়িকে অনেকটা সাধারণ মেহমান খানায় পরিণত করেন। এ জন্য বাহির থেকে রাসূল (স.)-এর খিদমতে যেসব মেহমান আসতেন তাঁদের অনেকেই হযরত উম্মু শুরাইকের বাড়িতে অবস্থান করতেন।[৫৫০]

হযরত উম্মু শুরাইক (রা.)-এর ইন্তিকালের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়নি।

---

[৫৪৯] *আত-তাবাকাত*, প্রাগুক্ত, ৮ম খন্ড, পৃ. ১৫৪

[৫৫০] *মহিলা সাহাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে কল্যাণময় করার সকল ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাহাবায়ে কিরাম যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, তা সকল যুগের মুসলিমদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ইসলাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাসূল (স.)-এর যুগেই তাঁরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন। সাহাবীগণের এক বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে উম্মাহাতুল মু'মিনীনসহ অনেক নারী সাহাবী। যাঁরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারে পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা'– এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে তুলে ধরতে গিয়ে বক্ষমান অভিসন্দর্ভটিকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে সাহাবী ও নারী সাহাবী পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা, সাহাবী শব্দের অভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ এবং সাহাবীগণের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে। মানবতার ধর্ম ইসলাম শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ইবাদত-বন্দেগী তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীদেরকে যথাযোগ্য অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলাম কন্যা হত্যা চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। স্ত্রীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের নির্দেশনা হলো, নারী নরের ভূষণ আর নর নারীর ভূষণ। উভয়ের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সমান সমান। মায়ের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের ঘোষণা হলো, মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত। আবার ঘোষিত হলো, পিতার চেয়ে মায়ের অধিকার তিন গুন বেশি। ইসলাম নারীকে সমাজের সম্মানিতা সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি দিল। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীদের পরামর্শ ও উপদেশ দানের অধিকার প্রদান করল। নারীর জন্য পিতা-মাতা, স্বামী,

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সম্পদে অংশ নির্ধারণ করল। সর্বাবস্থায়ই পুরুষের সাথে নারীও সম্পদের অধিকার লাভ করল।

ইসলাম বিয়ের ব্যাপারে নারীকে মতামত দানের অধিকার পরিপূর্ণভাবে প্রদান করেছে। কোনো মেয়েকেই তার মতের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিয়ে করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। নারীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দান করে অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতন হতে মুক্তি লাভের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বিয়ের সময় স্ত্রীকে মাহর প্রদান করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হলো। এ কথাও ঘোষণা করা হলো যে, মাহরের একমাত্র মালিক স্ত্রীই। এতে আর কারো কোনো অধিকার নেই।

নারীকে রুজি-রোজগার করে অর্থোপার্জনের অধিকারও ইসলাম প্রদান করেছে। ইসলামী নারীকে সর্ব বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদানের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এক্ষেত্রে নারী সাহাবীগণের জীবন চরিত ও কর্মকান্ড বাস্তব সাক্ষী। অনেক নারী সাহাবী শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অনেকেই শিক্ষিকার দায়িত্বও পালন করেন। যে সকল নারী রাসূল (স.)কে ঈমান অবস্থায় দেখেছেন এবং ঈমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, পরিভাষায় তাঁদেরকেই নারী সাহাবী বলা হয়। সমগ্র নারী জাতির উপর তাঁদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান স্বীকৃত। তাঁরা হচ্ছেন মুসলিম নারী সমাজের পথিকৃৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম পূর্ব যুগে নারীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম পূর্ব আরবে নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কন্যা সন্তানদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নিশ্চিত ছিলো না। অনেক পিতা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো, যাদেরকে জীবিত রাখা হতো, তাদেরকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সাথে লালন-পালন করা হতো। আত্মীয়-স্বজনদের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতে নারী ছিল চির বঞ্চিত। নিজের উপার্জিত অন্য কোনো প্রকারে প্রাপ্ত সম্পদেও তার কোনো অধিকার ছিলো না। শুধু আরব সমাজেই নয়, সারা বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

সকল ধর্ম ও সভ্যতায়ই নারী ছিল অবহেলিতা ও নির্যাতিতা। মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকার বলতে তাদের কিছুই ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। উম্মাহাতুল মু'মিনীন ঘরের জীবনে রাসূল (স.)কে যেমন সাহায্য করেছেন, তেমনি রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় ও ওফাতের পর ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত খাদীজা (রা.) ও হযরত আয়িশা (রা.)-এর ভূমিকা এক্ষেত্রে অনন্য। হযরত খাদীজা (রা.) সর্বপ্রথম নবুওয়্যাত ও রিসালাতের উপর ঈমান এনে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তারপর জীবনের সবটাই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে রাসূল (স.)-এর জীবনে ছায়ার মতো ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে হযরত আয়িশা (রা.) যে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছেন, তা মুসলিম জাতির জন্য চির স্মরণীয়। তিনি রাসূল (স.) থেকে ২২১০ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি কুরআন, হাদীস, তাফসীর ও সাহিত্যের পাঠদান করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) তাঁর গৃহ কেন্দ্রিক মসজিদে নববীর শিক্ষা বৈঠকে নিয়মিত দারস প্রদান করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে তার শিক্ষা বৈঠকে শিক্ষার্থীরা ছুটে আসতো। নারীরা শরীআতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর কাছ থেকে জেনে নিতো। তার ছাত্রের সংখ্যা ছিল দু'শতাধিক।

অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনের ভূমিকাও এক্ষেত্রে উজ্জ্বলতর। তাঁরা রাসূল (স.)-এর পারিবারিক জীবনের আর্দশের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে অন্যান্য নারী সাহাবীগণের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের সূচনা পর্বে কাফিরদের বাধা-বিপত্তি ও জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও পুরুষ সাহাবীগণের পাশাপাশি নারী সাহাবীগণও চূড়ান্ত রকমের সাহস ও দৃঢ়তার সাথে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। তাঁরা খুব সহজে শুধু ইসলাম গ্রহণই করেছেন তাই নয়, বরং

Dhaka University Institutional Repository

তারা অতি স্বচ্ছন্দভাবে ইসলামের প্রচারও করেছেন। হযরত উম্মু শুরাইক (রা.) ইসলামের প্রাথমিক পর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এই উপলব্ধি হয় যে, ঈমানের যে নি'আমত তিনি লাভ করেন তা অন্যদের সামনেও তুলে ধরা একান্ত কর্তব্য। তিনি মক্কার বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে অন্যান্য নারীদের কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরেন। কুরাইশরা তা জানতে পেরে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তিন দিন পর্যন্ত আটকিয়ে রাখে এবং খাবার-দাবার থেকেও তাঁকে বঞ্চিত রাখে। তবুও তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেননি।

এছাড়াও উহুদ যুদ্ধে হযরত উম্মু উমারা (রা.)-এর বীরত্ব, ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আসমা বিন্ত ইয়াযীদ (রা.) কর্তৃক নয়জন রোমান সৈন্যকে প্রতিহত করা এবং সাইপ্রাসের জলযুদ্ধে উম্মু হারাম (রা.)-এর অংশগ্রহণ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা আরো সমুজ্জ্বল করেছে। বদর, উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধে নারী সাহাবীগণ কখনো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে, কখনো সৈন্যদের পশ্চাতে থেকে তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দান, পানি পান করানো, আহতদের সেবা শুশ্রুষা, তীর কুড়িয়ে, দেয়া, খাদ্য তৈরি প্রভৃতি কর্মের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদানের স্বাক্ষর রাখেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের ভূমিকা নি:সন্দেহে মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অনুসরণীয় মাইলফলক। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নারী সাহাবীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বর্তমান যুগের মুসলিম নারীদের মাঝে ইসলামী চেতনাবোধের ক্ষেত্রে এক রেঁনেসার সৃষ্টি করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত নারী জাতি তাদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সন্ধান পাবে। তারা নিজেরা আলোক উদ্ভাসিত হয়ে দেশ ও জাতিকে আদর্শ মন্ডিত করার মহান পেশায় ব্রতী হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, নারী সমাজ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত হলে মানবজাতির সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ক্রমিক নং	গ্রন্থকারের নাম	গ্রন্থের বিবরণ
১.		*আল-কুরআনুল কারীম*
২.	ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী	*সহীহ আল-বুখারী,* মাক্তাবা রাশিদীয়া,দিল্লী; দারুল কুতুব আল ইলমিয়া, বৈরূত।
৩.	ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ আল-কুশাইরী (র.)	*সহীহ মুসলিম,* দারুল ফিকর, বৈরূত; শিরকাত মুখতার, দেওবন্দ, ১৯৮৬।
৪.	আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ আল-কাযবিনী	*সুনান ইবন মাজাহ,* আশরাফী বুক ডিপো, ইউ.পি. ভারত, ১৯৮৬।
৫.	ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল	*মুসনাদ,* দারুল ফিকর, বৈরূত, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮।
৬.	ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী	*জামি আত্-তিরমিযী,* মাকতাবা রাশিদীয়া, দিল্লি।
৭.	আবূ দাউদ সুলায়মান ইব্ন আশআস	*সুনান আবূ দাউদ,* মাকতাবা রাশিদীয়া, দিল্লি।
৮.	ইব্ন সা'দ	*আত-তাবাকাতুল কুরবা,* দারুল ফিকর, বৈরূত।
৯.	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী	*সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা,* আল-মুওয়াস্সাসাতুর-রিসালা, বৈরূত, ৭ম সংস্করণ, ১৯৪২।

Dhaka University Institutional Repository

১০.	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী	*তাযকিরাতুল হুফফায,* দারু ইহইয়াতুত-তুরাস আল ইসলামী, বৈরূত ।
১১.	ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আয-যাহাবী	*তারীখুল ইসলাম ওয়া তাবাকাত আল-মাশাইর ওয়াল-আ'লাম,* মাকাতাবাতুল কুদসী, কায়রো, ১৩৬৭।
১২.	ইব্ন হাজার আসকালানী	তাহযীবুত তাহযীব, দায়িরাতুল মা'য়ারিফ, হায়দরাবাদ, ১৩২৫হি।
১৩.	ইব্ন হাজার আসকালানী	*আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা,* দারুল কুতুব, মিসর, ১৯৭৮।
১৪.	ইব্ন হাজার আসকালানী	*ফাতহুল বারী,* বাবুল হালাবী, কায়রো, ১৩৭৮/১৯৫৯।
১৫.	ইব্ন ইমাদ আল-হাম্বলী	*শাজারাতুজ জাহব,* আল-মাকতাব আত-তিজারী, বৈরূত।
১৬.	আবুল হাসান আল বালাযুরী	*আনসাবুল আশ্‌রাফ,* দারুল মা'আরিফ, মিসর।
১৭.	ইব্ন কাসীর	*আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বৈরূত।
১৮.	ইব্ন কাসীর	*আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া,* মাকতাবাতুল মা'য়ারিফ, বৈরূত।
১৯.	আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল আসীর	*উসুদুল গাবা ফী-মা'রিফাতিস সাহাবা,* দারুল ইয়াহইয়া আত-তুরাসিল আরাবী, বৈরূত, ৫ম খন্ড।
২০.	সালীম তানীর	*আশ্‌-শা'ইবাতু মিনান নিসা,* দারুল কুতুব আল-আরাবিয়া, দামেস্ক, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

২১.	জুবরান মাসউদ	*আর-রাইদ মু'জাম লগুবী আসরী,* দারুল ইলম লিল মালাঈন, বৈরূত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৬।
২২.	ইবরাহীম মাদকুর	*আল-মু'জামুল ওয়াসীত,* কুতুবখানা হুসাইনিয়া, দেওবন্দ।
২৩.	ইয়াকুব ফিরোযাবাদী	*আল-কামুস আল-মুহীত,* দারুল ফিক্‌র, বৈরূত, ১৯৮৩, ১ম খন্ড।
২৪.	জালালুদ্দীন আবুল ফযল	*লিসানুল আরব,* দারুল ফিক্‌র, বৈরূত।
২৫.	আল-রাযী	*কিতাবুল জারহি ওয়াদ তা'দীল,* দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়া, বৈরূত, ১ম সংস্করণ, ১৯৫২, ১ম খন্ড।
২৬.	আবদুস সালাম নদভী	*উসুওয়াতুস সাহাবা,* মাক্‌তাবা আরিফাইন, করাচি, ১৯৭৬, ১ম খন্ড।
২৭.	এ্যাডওয়ার্ড উইলিয়াম লিন	*মাদ্দুল কামুস,* ইসলামিক বুক সেন্টার, লাহোর, ১৯৭২, ৪র্থ খন্ড।
২৮.	মুফতি মুহাম্মদ শফী	*তাফসীরু মা'আরিফুল কুরআন,* অনুবাদঃ মুহিউদ্দিন খান, ইফাবা, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ১৯৯১, ৮ম খন্ড।
২৯.	আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান আদ্‌-দারেমী	*সুনানুদ-দারেমী,* কাদীমী কুতুবখানা, করাচি, ১ম খন্ড।
৩০.	আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্‌ন কাসীর	*তাফসীরুল কুরআনিল আযীম,* মাকতাবাতু আলামিল ইসলামিয়া, পেশওয়ার।
৩১.	আবূ বকর জাস্‌সাস	*আহকামুল কুরআন,* সুয়াহেল একডেমী, লাহোর, ১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৩২.	আবুল হাসান আলী নদভী	*মাযা খাসারাল আলম বি ইনহিতাতিল মুসলিমীন।*
৩৩.	সম্পাদনা পরিষদ	*আলবাসুল ইসলামী*, লক্ষ্মৌ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ৪৪ বর্ষ, রবিউল আউয়াল সংখ্যা, ১৪২০ হি.।
৩৪.	মুহিউদ্দীন ইব্ন শারফ আন-নবুবী	*তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত,* আত্-তিবায়া আল-মুগীরিয়্যা, মিসর।
৩৫.	ইব্ন হাযম	*আসমাউস সাহাবা ওয়ার-রুয়াত,* দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৯২।
৩৬.	আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ	*আস-সিদ্দীকা বিন্ত আস-সিদ্দীক,* নাহযা, মিসর, ১৯৯৬।
৩৭.	সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী	*সীরাতে আয়িশা,* মাকতাবা মাদীনীয়া, লাহোর।
৩৮.	আবূ ওমার ইউসুফ ইব্ন আবদিল বার	*ইস্তি'য়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব,* দারুল নাহদাতিল মিসরিয়া, কায়রো, ১৮৮৫।
৩৯.	ইউসুফ আল-কানধালূবী	*হায়াতুস সাহাবা,* দারুল কালাম, দামেস্ক, ১৯৮৩।
৪০.	আল্লামা শিবলী নু'মানী	*সীরাতুন নবী,* মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ১৯৭৮।
৪১.	ড. আহমদ শালাবী	*আত্-তারীখ আল-ইসলামী,* কায়রো, ১৯৮২।
৪২.	আলাউদ্দীন আলী আল-মুত্তাকী	*কানযুল উম্মাল,* মুওয়াস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৫।
৪৩.	আল্লামা যারকানী	*শারহুল মাওয়াহিব,* কায়রো।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪.	ইব্ন হিশাম	*আস-সীরাতুন নবুবিয়্যাহ,* দারুল কুতুব মিসরিয়া, মিসর।
৪৫.	আবদুর রউফ দানাপুরী	*আসাহ আস-সিয়ার,* করাচি।
৪৬.	সাঈদ আন্সারী	*সিয়ারুস সাহাবিয়্যাত,* মাতবা'আ মা'আরিফ, আজমগড়, ভারত, ১৩৪১ হি।
৪৭.	নিয়াজ ফতেহপুরী	*সাহাবিয়্যাত,* নাফীস একাডেমী, করাচি।
৪৮.	আহমাদ খলীল জুমুআ	*নিসা মুবাশ্শারাত বিল জান্নাত,* দারু ইব্ন কাসীর, ২০০১।
৪৯.	আবূ নুয়াইম ইস্ফাহানী	*হিলয়াতুল আউলিয়া,* দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত, ১৯৬৭।
৫০.	আহমাদ খলীল জুমু'আ	*বানাত আস্-সাহাবা,* আল-যামানা, বৈরূত, ১৯৯৯।
৫১.	ওমার রিদা কাহ্হাল	*আ'লাম আন্-নিসা,* মুআস্সাসাতুর রিসালা, বৈরূত, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৪
৫২.	আহমাদ খলীল জুমু'আ	*নিসা মিন আসর আন-নবুওয়াহ,* দারু তায়্যিবাহ আল-খাদরা, মক্কা, ২য় সংস্করণ, ২০০০
৫৩.	মুহাম্মদ আল-হাকিম নিশাপুরী	*আল-মুসতাদরিক,* হায়দরাবাদ, ১৩৩৪ হি.।
৫৪.	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	*আসহাবে রাসূলের জীবনকথা,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৩।
৫৫.	ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম	*হাদীস চর্চায় মুসলমানদের অবদান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৫।
৫৬.	সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী	*পর্দা ও ইসলাম,* অনুবাদ: আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

৫৭.	শায়খুল হাদীস মাওঃ তফাজ্জল হোছাইন	*হযরত মুহাম্মদ (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,* সম্পাদনা- ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮।
৫৮.	শরীফ মুহাম্মদ রেজওয়ান	*নারী স্বাধীনতাঃ একটি নিরীক্ষাধর্মী পর্যালোচনা,* দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ৫ম খন্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর-১৯৯৬।
৫৯.	মাওলানা নো'মান আহমদ	*ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার,* শিবলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।
৬০.	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	*ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী,* অনুবাদঃ আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৭।
৬১.	ড. মাহবুবা রহমান	*কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারী,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০।
৬২.	মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ	*মোস্তফা চরিত,* ঝিনুক পুস্তিকা, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৫।
৬৩.	এফএম আবদুল জলীল	*মুসলিম সভ্যতায় নারী,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খুলনা, ১৯৮০।
৬৪.	অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শামসুল হুদা	*নারীর অধিকার ও মর্যাদা,* আশরাফিয়া বইঘর, ঢাকা, ১৯৯৫।
৬৫.	আবদুল খালেক	নারী, দীনী পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
৬৬.	তালিবুল হাশেমী	*মহিলা সাহাবী,* অনুবাদঃ আবদুল কাদের, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

৬৭.	শাহনাজ পারভীন	*ইসলামে নারীর অধিকার ও অবস্থান,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১০।
৬৮.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	*পরিবার ও পারিবারিক জীবন,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৩।
৬৯.	মমতাজ দৌলতানা	*ধর্ম, যুক্তি ও বিজ্ঞান,* জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬।
৭০.	ফাতিমা আলী	*ইসলাম ও নারী,* মাসিক মদীনা, জুন-১৯৯৫।
৭১.	সম্পাদনা পরিষদ	*ইসলামী বিশ্বকোষ,* ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬।
৭২.	Prof. Abdel Rahim Omran	***Family Planning in the legacy of Islam,*** Published with the United Nations Population Fund, London, New York, 1992
৭৩.	Bettany G.T.	***The World Religions,*** London. 1890
৭৪.	Afroza Begum	***Rights of Women under Muslim law;*** Principles and Practice in Bangladesh, Islamic University Studies, Vol-2, No-1, 1990